মানুষী

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বন্ধুবরেষু

মানুষী

ট্রেন ছাড়ার ঠিক কুড়ি মিনিট আগে হাওড়ায় পেঁছে গেলেন মল্লিনাথ— মল্লিনাথ চৌধুরী। তাঁর লেটেস্ট মডেলের এয়ার-কনডিশানড বিদেশী লিমুজিন স্টেশনের ভেতরকার পার্কিং এরীয়ায় চলে এসেছিল। গাড়িটা থামতেই সদা তৎপর অবিনাশ ফ্রন্ট সীট থেকে দ্রুত নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে দেয়।

অবিনাশের বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। পরিষ্কার কামানো তরতরে মুখ তার, মাঝারি হাইট, ভাল স্বাস্থ্য। পরনে দামী ট্রাউজার্স এবং বুশ শার্ট। এক নজরে তাকে কোনো মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির প্রফেসানাল ম্যানেজার মনে হতে পারে। আসলে সে মল্লিনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি, তার একান্ত ব্যাক্তিগত নানা ধরনের কাজকর্ম করে দেয়, যার অধিকাংশই অত্যন্ত গোপন এবং হয়ত বা নিষিদ্ধও। অবিনাশের প্রভুভক্তির তুলনা নেই। মল্লিনাথের প্রতি তার আনুগত্য পোষা কুকুরের মতো।

মল্লিনাথ ব্যাক সীট থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ। বেশ ভাল হাইট তাঁর। চুল ব্যাকব্রাশ করা। পরনে নিখুঁত সাফারি স্যুট, পায়ে চকচকে ব্রাউন শু। চোখে মোটা ফ্রেমের ফ্যাশনেবল চশমা। সব মিলিয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঝকঝকে চেহারা।

মল্লিনাথ একজন বড় মাপের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অর্থাৎ শিল্পপতি। জুট, পেপার, টায়ার, ইঞ্জিনীয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, টেক্সটাইলস ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস। একটা সাম্রাজ্যই বলা যায়। এখানেই তিনি থেমে যান নি, দেশের নানা প্রভিন্সে নতুন নতুন প্রোডাকসান ইউনিট খোলার পরিকল্পনা করে চলেছেন। 'আত্মতুষ্টি' শব্দটাকে তিনি ঘৃণা করেন। তাঁর মতে যার গ্রোথ নেই—তা সে মানুষই হোক, ইণ্ডাস্ট্রিই হোক বা অন্য

কিছু—তার ভবিষ্যৎ নেই। অর্থাৎ কোনো ভাবেই থামা চলবে না। অবিরত এগিয়ে যেতে হবে।

স্বাধীনতার পর ব্যবসা-বাণিজ্য, ইণ্ডাস্ট্রি থেকে বাঙালীরা ক্রমাগত পিছু হটছে। তাদের এই ধারাবাহিক অধঃপতনের মধ্যে মল্লিনাথকে দেখলে যথেষ্ট আশান্বিত হওয়া যায়। অথচ অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মেছেন। ঝকঝকে কেরিয়ার, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, ইত্যাদি তৈরি করতে সাহায্য করে এমন জমকালো পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড বা বংশপরিচয় তাঁর নেই। মল্লিনাথের অতীত নেহাতই ম্যাড়মেড়ে, সাদামাটা। বাবা ছিলেন এক মফঃস্বল শহরের স্কুলে অঙ্কের টীচার। একেবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মতো হাল না হলেও সংসার চালাতে চোখে প্রায় অন্ধকার দেখতেন। স্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে সমস্ত দিনের বেলাটা তো বটেই, অনেকটা রাত পর্যন্ত বাবা চরকির মতো সারা শহরে টহল দিয়ে টুইসানি করতেন।

এমন পিতৃপরিচয় নিয়ে বেশিদূর এগুনো যায় না। কিন্তু দুর্দান্ত ছাত্র ছিলেন মল্লিনাথ। আগাগোড়া স্কলারশিপের টাকায় পড়াশোনা করছেন। অসাধারণ মেধা আনকোরা ছুরির মতো শাণিত ব্যবসায়িক বুদ্ধি, অদম্য জেদ আর উচ্চাঙ্কাক্ষা এবং ঝুঁকি নেবার প্রবল দুঃসাহস তাঁকে আজ এরকম একটা উচ্চতায় পেঁছে দিযেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে অনুরাধার বাবা প্রিয়তোষ মল্লিকের কাছে তাঁর ঋণ আর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অনুরাধা তাঁর স্ত্রী। কিন্তু অনুরাধা এবং প্রিয়তোষের কথা এখন নয়।

মল্লিনাথের কয়েক ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল অবিনাশ। সে জানে এবার তাকে কী করতে হবে। কোমরে ক্ষিপ্র একটি মোচড় দিয়ে লিমুজিনের ব্যাক সীট থেকে মল্লিনাথের অ্যাটাচি কেস আর ক্যারিয়ার থেকে ঢাউস সুটকেস, জলের বোতল, বাস্কেট, ওষুধের বাক্স, খাবারের হট কেস, ইত্যাদি বার করে একটা কুলি ডেকে তার মাথায় চাপিয়ে দেয়। তারপর শোফারকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে ব্যস্তভাবে মল্লিনাথের দিকে তাকায়, 'আসুন স্যর, হাতে বেশি সময় নেই।' বলেই চৌকস গাইডের মতো রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে থাকে।

এই মুহূর্তে চারপাশে গমগমে ভিড়। যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু মানুষ আর মানুষ, আর ডাঁই-করা মালপত্রের পাহাড়। সামান্য লক্ষ করলে বোঝা যাবে, হাওড়া স্টেশন যেন একখানা মিনিয়েচার ইণ্ডিয়া। বিহারী বাঙালী ওড়িয়া মারাঠী কোঙ্কনী কেরলী তামিল গুজরাতী—গোটা দেশের সমস্ত অঞ্চলের মানুষ এখানে পাওয়া যাবে। চাপ-বাঁধা ভিড়কে ছুঁচের মতো এফোঁড়-ওফোঁড় করে লাল কুর্তা-পরা কুলির ঝাঁক স্টেশনের এ মাথা থেকে ও মাথায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটি করছে। সমস্ত এলাকাটা জুড়ে হই-চই চিৎকার ব্যস্ততা উত্তেজনা এবং ধাক্কাধাক্কি। এরই মধ্যে সুকণ্ঠী ঘোষিকা অদৃশ্য মাইকে অনবরত জানিয়ে দিচ্ছে, কোন ট্রেন কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে ক'টা বেজে কত মিনিটে আসছে অথবা কোন ট্রেন কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ক'টায় ছেড়ে যাচ্ছে।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পায়ে পায়ে হোঁচট এবং ধাক্কা খেতে খেতে অবিনাশের পাশাপাশি হাঁটছিলেন মল্লিনাথ। তাঁর মতো একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের পক্ষে ট্রেনে চড়ে নষ্ট কবার মতো অঢেল সময় নেই। মল্লিনাথের কাছে প্রতিটি মুহূর্তই অতি মূল্যবান। তবু যে তিনি ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন তার কারণ একটি অচেনা যুবতী। হাওড়া থেকে বম্বে পর্যন্ত লম্বা সফরে সে তাঁকে সঙ্গ দেবে।

মল্লিনাথ জিতেন্দ্রিয় শুকদেব নন। মাঝে মাঝে ঠাসা কাজের ফাঁকে একটু সময় বার করে গোপনে এক একটি সঙ্গিনী নিয়ে ট্রেনে বা মোটরে বেরিয়ে পড়েন। এদের জুটিয়ে আনে অবিনাশ।

আলাদা আলাদা সফরে আনকোরা নতুন নতুন সহচরীরা থাকে। একবার যাকে মল্লিনাথের সঙ্গে ট্রেনে বা মোটরে তুলে দেওয়া হয়, দ্বিতীয় বার তাকে আর ডাকা হয় না। কিন্তু প্রতিটি সফরে অবিনাশ সঙ্গে থাকবেই। প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী, বশংবদ অবিনাশ। মল্লিনাথের কাছে এটাই তার একমাত্র ডিউটি। এ খবর, পৃথিবীর আর কেউ জানে না।

একসময় নিচু গলায় মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'সে কি এসেছে?'

মল্লিনাথ কার কথা বলছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না অবিনাশের।

বলে, 'নিশ্চয়ই এসে গেছে স্যর। মেয়েটা হাইলি প্রফেসানাল। হাত পেতে অ্যাডভান্সের টাকা যখন নিয়েছে, কোনোরকম গোলমাল করবে না। ওদের কাছে স্যর, টাকাটাই আসল।' তার গলায় বিনয়ের সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানো।

মল্লিনাথ জানেন কম্পিউটারের দক্ষতায় সব কিছু করে থাকে অবিনাশ। তার কাজে কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকে না। অবিনাশের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। মেয়েটির হাওড়ায় চলে আসা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার জিজ্ঞেস করেন, 'আমার পরিচয় টরিচয় দাও নি তো?' প্রতিবার মেয়ে জুটিয়ে আনার পর এই-প্রশ্নটা তিনি করে থাকেন।

অবিনাশ বলে, 'না স্যর, তেমন উজবুক আমি নই। হোল ইণ্ডিয়ায় আপনার কত বড় প্রেস্টিজ, আমি জানি না?'

তাঁর সম্মান, মর্যাদা নষ্ট হয়, এমন কোনো কাজ অবিনাশকে দিয়ে করানো অসম্ভব। এই কারণে মল্লিনাথ তাকে খুবই পছন্দ করেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে বম্বে মেলের এয়ার-কনডিশানড কোচের একটি আরামদায়ক কুপেতে মল্লিনাথকে নিয়ে আসে অবিনাশ। এই কুপের গোটাটাই মিস্টার এম. চৌধুরীর নামে রিজার্ভ-করা। মল্লিনাথ চৌধুরী নামটা অনেকেরই চেনা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নামের আদ্যক্ষর এবং পদবী দিয়ে কুপেটা সংরক্ষিত করা হয়েছে। একটি যুবতীকে নিয়ে গোপনে মল্লিনাথ রেল ভ্রমণে বেরিয়েছেন, সেটা জানাজানি হওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়।

কুপেটা রিজার্ভ করা হলেও কেউ যাতে ঝঞ্ঝাট বাধাতে না পারে, সে জন্য অবিনাশের পকেটে তিনটে আলাদা আলাদা খামে বেশ কয়েকখানা করে কড়কড়ে কারেন্সি নোট রয়েছে। যে টিকেট চেকার হাওড়া থেকে এই ট্রেনে ডিউটি দিতে উঠবে তার জন্য একটি খাম, বিলাসপুরে প্রথম টি সি নেমে গেলে তার জায়গায় যে আসবে দু নম্বর খামটি তার, ওয়ার্ধা কি নাসিকে তৃতীয় যে টি সি উঠবে তিন নম্বর খামটি তার জন্য বরাদ্দ। অবিনাশের বন্দোবস্ত একেবারে ফুল-প্রুফ, কোথাও এতটুকু ছিদ্র পাওয়া যাবে না। তার মতে কারেন্সি নোটের মতো চরিত্র হননের দক্ষতা আর কিছুতেই

নেই। আশা করা যায়, মল্লিনাথের টানা দেড় দিনের সফর এরপর পুরোপুরি নির্বিঘ্নই হবে।

গাদা গাদা মানুষের ভিড় ঠেলে হাঁটার অভ্যাস নেই মল্লিনাথের। কিছুটা ক্লান্তই হয়ে পড়েছিলেন তিনি, ধীরে ধীরে একটা সীটে বসে পড়েন।

ওদিকে কুলিদের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তার অফুরন্ত প্রফেসানাল দক্ষতায় মল্লিনাথের সুটকেস এবং বাস্কেট খুলে ব্রাশ, পেস্ট, তোয়ালে, হেয়ার টনিক লোশনের শিশি, বাড়িতে পরার পাজামা-পাঞ্জাবি ইত্যাদি বার করে টয়লেটে গুছিয়ে রেখে আসে অবিনাশ। জলের বড় পাত্র এবং কফি বোঝাই ফ্লাস্ক দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে দেয়। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং রক্তের ভেতরকার শর্করা আর ফ্যাটকে কনট্রোলে রাখার জন্য প্রচুর ট্যাবলেট খেতে হয় মল্লিনাথকে। কুপের দুই জানালার মাঝখানে তাক-ওলা বড় আয়না লাগানো রয়েছে। তাকের ওপর নানা চেহারার ওষুধের কৌটো এবং শিশি সাজিয়ে রাখতে থাকে অবিনাশ। মল্লিনাথের প্রতিদিনের রুটিন, তাঁর অভ্যাস, মুদ্রাদোষ, খাদ্যতালিকা—সবই অবিনাশের মুখস্থ। কেন না, মাঝে মাঝেই তো তাঁকে নিয়ে গোপন সফরে বেরুতে হয়। তখন কে তাঁর আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেবে?

মল্লিনাথদের নিউ আলিপুরের বিশাল বাংলোয় বারো চোদ্দটি বয় আর বেয়ারা মজুদ রয়েছে। তাদের কাউকে এ জাতীয় নিষিদ্ধ সফরে সঙ্গে আনাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাতে জানাজানি হবেই। আর এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে মল্লিনাথের তা ভাবতেও সাহস হয় না। কাজেই অবিনাশের ওপরেই পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়।

মল্লিনাথ অবিনাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন, মেয়েটার কথা আবার জিজ্ঞেস করবেন কিনা। তিনি জানেন ট্রেন ছাড়ার আগেই তার সঙ্গে দেখা হবে। তবু অদম্য এক কৌতূহল তাঁকে যেন পেয়ে বসছিল, সেই সঙ্গে এক ধরনের উত্তেজনা রক্তের ভেতর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হলেও মধ্যবিত্তের পুরনো সংস্কার এবং রক্ষণশীলতার ট্রাডিসন এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর চেনা-জানা বিজনেসম্যান আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের

অনেকেই আমোদের জন্য মিসট্রেস রেখেছেন। এ নিয়ে তাঁদের লুকোচুরি বা ঢাকাঢাকির ব্যাপার নেই, নেই লজ্জা বা গ্লানিবোধ। আগেকার দিনে নেটিভ স্টেটের রাজা মহারাজা জমিদার এবং সৌখিন বড়লোকেরা বাইজি জাতীয় মেয়েমানুষ পুষতেন। তাঁদের আমল শেষ। ওঁদের জায়গা দখল করেছেন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেসম্যান, বিগ কনট্রাক্টর আর রিয়াল এস্টেটের প্রোমোটাররা। এঁরা আর লক্ষ্ণৌ বেনারস থেকে পান-জর্দা-খাওয়া হীরেয় মোড়া, ঠুংরি আর গজল গাইয়ে রূপসীদের আনিয়ে বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন না। এ সবের স্টাইল আজকাল পালটে গেছে। দারুণ দারুণ চেহারার স্মার্ট, তোড়ে ইংরেজি বলা তরুণীদের পি. এ বা কনফি-ডেন্সিয়াল সেক্রেটারি করার রেওয়াজ এখন। একই সঙ্গে কাজের সহায়িকা এবং আনন্দসঙ্গিনী। অবশ্য পি. এ বা কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারি হলেই রক্ষিতা হতে হবে এমন নিয়ম নেই, প্রচুর ব্যতিক্রমও রয়েছে। তখন অন্যভাবে মিসট্রেস জোগাড় করা হয়। মোট কথা, গজল গাইয়ে বাইজিদের জায়গায় আজকাল এসে গেছে ঝকঝকে আধুনিকারা।

কিন্তু মল্লিনাথ ফার্স্ট জেনারেসান বড়লোক। মিডল ক্লাস মোরালিটির ভাইরাস ধুয়ে রক্তকে শোধন করে নিতে পারেন নি। তাঁর দুশ্চিন্তা, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলেন। আর ধরা পড়া মানেই কেচ্ছা, কেলেঙ্কারি, স্ক্যাণ্ডাল। ভয় নিজের স্ত্রী অনুরাধাকেও। ঠিক অনুরাধাকে নয়, তাঁর ইমেজ অর্থাৎ ভাবমূর্তিকে। কিন্তু সে সব কথা পরে।

অবিনাশ বুঝিবা তুখোড় থট-রিডার। সুচারুভাবে হাতের কাজ শেষ করতে করতে বলে, 'স্যার, ওষুধগুলো গুছিয়ে রেখেই মণিকাকে নিয়ে আসছি।'

মল্লিনাথ বাইরে বিশেষ আগ্রহ দেখান না। খানিকটা নিস্পৃহ সুরে বলেন, 'ওর নাম বুঝি মণিকা?'

অবিনাশ জানায় এ জাতীয় মেয়েমানুষদের যা পেডিগ্রি তাতে মায়ের কাছ থেকে এমন একটা তকতকে মডার্ন নাম পাওয়া বিস্ময়কর। খুব সম্ভব এই নামটা নিজেই দিয়েছে সে।

মল্লিনাথের কপালে ভাঁজ দেখা দেয়। একটু সন্দিগ্ধভাবে

বলেন, 'একেবারে থার্ড ক্লাস জায়গা থেকে জঘন্য কাউকে নিয়ে এসেছ নাকি ?'

রীতিমত ক্ষুণ্ণই হয় অবিনাশ। বলে, 'স্যর, এতদিন আপনার কাছে আছি। আমি কি আপনার পছন্দ-অপছন্দ জানি না ? আগে মণিকাকে নিয়ে আসি। দেখলে বুঝবেন এমন মেয়ে দশ লাখে একটা মেলে না। নট আ সিঙ্গল ইন আ মিলিয়ন।' জোর দেবার জন্য ইংরেজি ভাষাটাকে আধা-আমেরিকান উচ্চারণে ব্যবহার করে সে।

অবিনাশ অবশ্য এমন দাবী করতেই পারে। এখন পর্যন্ত সারা কলকাতা তোলপাড় করে যাদের সে খুঁজে এনেছে তাদের কাউকেই নাকচ করা যায় না। এদের কেউ কেউ এতই সুন্দর যে স্রেফ রূপের কারণে সিনেমার বহু নায়িকার নাক কেটে দিতে পারে। মল্লিনাথ আস্তে হাত নেড়ে বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোথায় ওয়েট করতে বলেছ মেয়েটাকে ? প্ল্যাটফর্মে ?'

'না স্যর। একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে ওর থাকার কথা। খুঁজে দেখতে হবে।' অবিনাশ বলে।

এবার বেশ অবাকই হ'ন মল্লিনাথ। বলেন, 'সেখানে কেন ?'

অবিনাশ যা উত্তর দেয় তা এইরকম। এই কুপেতে মণিকা মল্লিনাথের সঙ্গিনী হবে ঠিকই, তবু তার জন্য ফার্স্ট ক্লাসেরও একখানা টিকেট কেটে রেখেছে সে। কেননা, হাওড়া স্টেশনে এক শ'টা প্যাসেঞ্জারের মধ্যে চার-পাঁচটা চেনা লোক বেরিয়ে পড়বেই। তাদের কেউ দিল্লী লক্ষ্ণৌ কি মাদ্রাজ বাঙ্গালোর থেকে আসছে, কেউ বা লটবহর নিয়ে বাইরে চলেছে। তাদের কারো চোখে পড়ে যেতে পারেন মল্লিনাথ। মণিকাকে তাঁর সঙ্গে দেখলে ভনভনে মাছির মতো তারা তাঁকে ছেঁকে ধরবে। এই সব সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে নিজের এবং মণিকার জন্য ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কেটেছে অবিনাশ। ট্রেন ছাড়ার মিনিট দুই তিন আগে সে মেয়েটাকে এখানে নিয়ে আসবে। তেমন বুঝলে হাওড়ায় তাকে আনবেই না।

অবিনাশের দূরদর্শিতায় মল্লিনাথ মুগ্ধ। নতুন করে আরেক বার টের পান, এরকম ধুরন্ধর একটি লোক এ জাতীয় প্রমোদভ্রমণে কাছাকাছি থাকলে দুর্ভাবনার কারণ নেই। তিনি আর কোনো প্রশ্ন

করেন না।

ওষুধের শিশিটিশি সাজানো হয়ে গিয়েছিল। খাবার ভর্তি চার-পাঁচটা হট-কেস গুছিয়ে রেখে অবিনাশ দ্রুত ঘড়ি দেখে বলে, 'ট্রেন ছাড়তে ন'মিনিট বাকি। যাচ্ছি স্যর।' বলে বাইরের প্যাসেজে বেরিয়ে কুপের দরজাটা টেনে দেয়। সে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। এই কুপেটার পাশাপাশি আরো অনেকগুলো কুপে রয়েছে। প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে কোনো চেনা প্যাসেঞ্জার যাতে মল্লিনাথকে দেখে না ফেলে তারই ব্যবস্থা করে গেছে অবিনাশ।

মল্লিনাথের কুপের একদিকে প্ল্যাটফর্ম। কাচের জানালা দিয়ে বাইরের যাত্রীদের ছোটাছুটি চোখে পড়ছে। তবে জানালা এমনভাবে আটকানো যে প্ল্যাটফর্মের হইচই তেমন শোনা যায় না। ঝিঁঝির অস্পষ্ট ডাকের মতো আওয়াজ ভেসে আসছে। প্যাসেজের দিকটায় দরজা বন্ধ থাকায় কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। তবে অন্য কুপের লোকজন যে যাওয়া-আসা করছে, পায়ের আওয়াজ এবং হাঁকা-হাঁকিতে তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যমনস্কর মতো প্ল্যাটফর্মের দৃশ্য দেখছিলেন মল্লিনাথ। নিছক আনন্দ-ফুর্তির জন্য তিনি ট্রেনে চড়েছেন, এমন ভাবার কারণ নেই। মল্লিনাথের জীবনে প্রতিটি মিনিট এমনই মূল্যবান যে এভাবে অপচয় করার মতো যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে নেই। পুনে শহরের কাছে লোনিতে বম্বের এক বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের সঙ্গে জয়েন্ট কোলাবরেসনে তাঁরা একটা ইলেকট্রনিক ফ্যাক্টরি বসাবেন। সেই ব্যাপারটা ফাইনাল করতে এবার তাঁর বম্বে যাওয়া। এগ্রিমেন্টটা হয়ে গেলে নতুন কোম্পানি তৈরি করে তাঁরা লেটার অফ ইনটেন্টের জন্য দিল্লীতে অ্যাপ্লাই করবেন।

সূর্যোদয় থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মল্লিনাথের প্রতিটি দিন নানা কর্মসূচিতে বোঝাই থাকে। আঠার কুড়িটা বিশাল বিশাল বিখ্যাত কোম্পানিতে কী কী প্রোডাক্ট তৈরি হবে, স্টেট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে কিভাবে সুসম্পর্ক বজার রাখা হবে, বার্ষিক টার্নওভার বাড়াতে কী জাতীয় কৌশল নেওয়া হবে, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য কিভাবে ব্যালান্স শীট তৈরি করতে হবে, ইত্যাকার সমস্ত বিষয়ে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত সংরক্ষিত। এর ভেতব

থেকে এবার পুরোপুরি তিরিশটি ঘণ্টা নিজের জন্য বার করে নিয়েছেন। বাংলায় একটা পুরনো প্রবাদ আছে—'রথ দেখা আর কলা বেচা'। এবার এই দুই উদ্দেশ্যেই ট্রেনে করে বম্বে চলেছেন মল্লিনাথ।

হঠাৎ জানালার বাইরে, কাচের পাল্লার ধার ঘেঁষে একটা অত্যন্ত চেনা মুখ দেখা যায়। সুকুমার সান্যাল। নাম-করা এক ইংরেজি দৈনিকের সে দুর্ধর্ষ স্পেশাল করেসপনডেন্ট। ইদানীং ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং, অর্থাৎ অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলে যে চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটা চালু হয়েছে তাতে সুকুমারের প্রচণ্ড সুনাম।

মল্লিনাথ চমকে ওঠেন। সুকুমারকে দেখামাত্র তাঁর হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন আচমকা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বুঝতে পারেন, জানালার দিকে মুখ করে ওভাবে বসে থাকা তাঁর ঠিক হয় নি।

ওদিকে সুকুমারের চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা আর বিস্ময় ফুটে বেরিয়েছে। জানালার কাচে চাপড় মেরে মেরে চেঁচিয়ে সে কিছু বলছে কিন্তু বিশেষ কিছুই শোনা যায় না। সুকুমার যেন তা বুঝতে পেরে ইশারায় জানিয়ে দেয়, সে কুপেতে আসছে।

একটু পরেই ডান দিকের দরজা দিয়ে কমপার্টমেন্টে উঠে সোজা মল্লিনাথের কুপেতে চলে আসে সুকুমার। প্রায় চিৎকার করেই বলে, 'হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! প্লেনের বদলে এই প্রোলেতারিয়েতদের ট্রান্সপোর্টে আপনাকে দেখব, ভাবতে পারি নি। বসতে পারি?'

দারুণ ঝকঝকে, স্মার্ট চেহারা সুকুমারের। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। পরনে জীনস এবং ব্যাগি শার্ট, পায়ে মোটা সোলের স্পোর্টস শু, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, গালে তিন-চার দিনের না-কামানো দাড়ি, মাথায় উষ্কখুষ্ক চুল, বাঁ হাতে চওড়া ব্যাণ্ডে ঢাউস ইলেকট্রনিক ঘড়ি।

মল্লিনাথ সুকুমারকে দেখে এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছেন যে উত্তর দিতে সময় লাগে। ভদ্রতার খাতিরে তাকে বসতে বলার আগেই সুকুমার মুখোমুখি একটা বার্থে বসে পড়ে। বলে, 'তারপর স্যার, এই ট্রেনে নিশ্চয়ই বম্বে চলেছেন?'

খানিক আগে হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি বেড়ে গিয়েছিল মল্লিনাথের। এবার সেটা যেন একেবারে থেমে যায়। তাঁর খেয়াল হয়, অবিনাশ এখনই মণিকাকে নিয়ে এসে পড়বে। একজন ঝানু সাংবাদিক যে কিনা অন্তর্তদন্তমূলক রিপোর্টিং করে হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছে, তাঁর কুপেতে মেয়েটিকে দেখে ফেললে তার পরিচয় জানতে চাইবে, তাঁর সঙ্গে মণিকার কী সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়ে হাজারটা প্রশ্ন করে জিভ বার করে ছাড়বে। সুকুমারের মতো জার্নালিস্টরা ক্রিমিনাল ল-ইয়ারদের চাইতেও একগুঁয়ে আর নাছোড়বান্দা। পেটের ভেতর থেকে মণিকা সম্বন্ধে আসল খবরটা কখন কিভাবে বার করে নেবে, টেরও পাওয়া যাবে না। তারপর এই নিয়ে খবরের কাগজে লেখা-লেখি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, স্ক্যান্ডাল—নাঃ আর ভাবা যাচ্ছে না। মল্লিনাথের রক্তচাপ দ্রুত হুড় হুড় করে নেমে যেতে থাকে। টের পান, মাথাটা ভীষণ ঝিম ঝিম করছে। কোনোরকমে বলেন, 'হ্যাঁ।'

এবার যে প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক নিয়মে আসা উচিত, অর্থাৎ 'প্লেনের বদলে কেন মল্লিনাথ ট্রেনে বম্বে যাচ্ছেন'—সেটা আর করে না সুকুমার। বলে, 'বম্বেতে এমন কোনো ব্যাপারে কি যাচ্ছেন তা নিউজ হতে পারে?'

লোনির ইলেকট্রনিকস কারখানার বিষয়টা এখনও পর্যন্ত গোপনই রাখা হয়েছে। সব কিছু হয়ে যাবার পর মীডিয়ার লোকজনদের ডেকে জানিয়ে দেবার ইচ্ছা মল্লিনাথের। বলেন, 'এ নিয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

খবরের গন্ধে দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে সুকুমার। বলে, 'তার মানে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আপনি যখন যাচ্ছেন, আই থিংক ইট মাস্ট বী আ বিগ থিং।'

'এই মোমেন্টে আমার কিছু বলার নেই। জাস্ট ওয়েট ফর আ কাপল অফ উইকস।'

'বেশ, ওয়েট করব। আমি যেন খবরটা আগে পাই।'

'দেখা যাক।' বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন মল্লিনাথ, 'ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট তিনেক বাকি মিস্টার সান্যাল। এবার আপনার নেমে যাওয়া দরকার।' তিনি

চান না আর এক সেকেন্ডও সুকুমার তাঁর কুপেতে থাকে। টের পাচ্ছিলেন, এয়ার-কনডিশানড শীতলতার মধ্যেও জামাটামা ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে। সুকুমারের সঙ্গে কথা বললেও তাঁর চোখ রয়েছে জানালার বাইরে। অবিনাশরা এই কামরায় ওঠার আগেই মরিয়া হয়ে তাঁকে কিছু একটা করতেই হবে কিন্তু কী করবেন সেটাই ভেবে উঠতে পারছেন না।

সুকুমারের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। তার ওঠার লক্ষণও দেখা যায় না। নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলে, 'নো প্রবলেম স্যর। আমিও বম্বে যাচ্ছি।'

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে মল্লিনাথের। সুকুমার যে এই ট্রেনেই বম্বে চলেছে, এটা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল, কাউকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছে। যাই হোক, এখন থেকে পুরো তিরিশ ঘণ্টা মল্লিনাথের টেনশান কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

সুকুমার থামে নি, 'আপনার কুপেতে অন্য প্যাসেঞ্জার কেউ আছে?'

স্নায়ুতে জোরালো ধাক্কা লাগে মল্লিনাথের। সুকুমার কি কিছু টের পেয়েছে? চোখের কোণ দিয়ে তাকে সতর্কভাবে লক্ষ করেন মল্লিনাথ। কিন্তু না, তেমন কোনো আভাস পাওয়া যায় না। আবছাভাবে বলেন, 'না। আমি একাই এই কুপেটা 'বুক' করেছি।'

'ফাইন। লাকিলি আর আনএক্সপেক্টেডলি আপনাকে এভাবে একা পাওয়া গেছে। এই চান্সটা কিছুতেই ছাড়ব না। আপনি মাস চারেক আগে আমাকে একটা কথা দিয়েছিলেন—মনে আছে?'

এই মুহূর্তে কোনো কিছু সুশৃঙ্খলভাবে ভাবার বা মনে করার মতো মানসিক অবস্থা নেই মল্লিনাথের। এক একটি সেকেন্ড কাটছে আর স্নায়ুগুলো ততই বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। কাঁপা গলায় মল্লিনাথ জানান, কোনো প্রতিশ্রুতির কথা তাঁর মনে পড়ছে না।

সুকুমার বলে, 'সেই যে মাস চারেক আগে আমাদের কাগজে আপনার ছোট একটা ইন্টারভিউ ছেপেছিলাম, তখনই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ট্রেড আর ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আপনার একটা বড় লেখা

চেয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন, লেখার সময় পাবেন না, তবে মুখে মুখে বলে যেতে পারেন। আমি টেপ করে নিয়ে পরে তা থেকে লিখে আর্টিকলটা আপনাকে দেখিয়ে নেবো। দরকার মতো আপনি অ্যাডিসান অলটারেসান করে ছাপতে দেবেন।'

এবার মনে পড়ে যায় মল্লিনাথের। খুব নিরাসক্ত স্বরে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, এরকম একটা কথা হয়েছিল।'

সুকুমার বলে, 'কিন্তু স্যর, এই চার মাসে আপনার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে বেশ কয়েক বার ফোন করেছি কিন্তু ইউ ওয়ার টেরিবলি বিজি, তাই আমাকে সময় দিতে পারেন নি।

মল্লিনাথ উত্তর দেন না। তিনি শুধু রুদ্ধশ্বাসে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সুকুমারের কথার ফাঁকে দু-একবার মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা যতদূর সম্ভব দেখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু না, ভিড়ের ভেতর কোথাও নেই অবিনাশেরা। কী হতে পারে তাদের? মেয়েটা কি তা হলে পৌঁছয় নি কিংবা অন্য কোনো ঝামেলা হয়েছে?

সুকুমার মল্লিনাথকে লক্ষ করেছিল। সে বলে, 'কারুর কি আসার কথা আছে স্যর?'

মল্লিনাথ চকিত হয়ে ওঠেন। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে মল্লিনাথকে দেখতে দেখতে বলেন, 'না না, কে আসবে?'

সুকুমার খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলে, 'না, মানে যেভাবে বাইরে তাকাচ্ছেন, মনে হল কাউকে এক্সপেক্ট করছেন।'

মল্লিনাথ খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যেখানে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন, 'আমি কী করছি না করছি তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই। ইউ মে কুইট দিস কুপে।' তার বদলে ভড়কানো বালকের মতো বলে ওঠেন, 'না না, আমি এই ভিড়টিড় দেখছিলাম। অনেকদিন ট্রেনে চড়িনি তো, তাই ধারণা ছিল না। এখন দেখছি রেলের প্যাসেঞ্জার ভীষণ বেড়ে গেছে।'

'তা তো বাড়বেই স্যর। যেভাবে পপুলেসান এক্সপ্লোসান হচ্ছে, হু-হু করে মানুষ বেড়ে চলেছে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার

বাড়াটাই তো স্বাভাবিক।' এয়ার-কাণ্ডিশানড কোচ আর ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া এখনই অন্য সব কোচে লোক গাদাগাদি করে যায়। এরপর দেখবেন ট্রেনের মাথায় চড়ে যাচ্ছে।'

কথায় কথায় খানিকটা সতর্ক হয়ে গেছেন মল্লিনাথ। সুকুমার যাতে ধরতে না পারে সেটা মাথায় রেখে চোখের কোণ দিয়ে প্ল্যাটফর্ম দেখতে থাকেন। অস্পষ্ট গলায় বলেন, 'হুঁ—'

সুকুমার বলেন, 'এটা ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজের প্রবলেম। আমাদের মাথা না ঘামলেও চলবে। নাউ অন টু বিজনেস স্যর। আপনি আমার সম্বন্ধে সিমপ্যাথেটিক না হলে এই পুওর ফেলার চাকরিটা আর থাকে না।'

প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যেও একটু অবাক হয়েই সুকুমারের দিকে তাকান মল্লিনাথ। বলেন, 'মানে?'

'ভেরি সিম্পল চৌধুরীসাহেব। আপনার আর্টিকলটার কথা এডিটরকে বলেছি। তিনি আপনাকে একটা ফর্মাল ইনভিটেসনও পাঠিয়েছেন। লেখাটার জন্যে রোজ আমাকে তাগাদা দিচ্ছেন।' সুকুমার বলতে থাকে, 'চার মাসে যদি একটা লেখা জোগাড় করতে না পারি, তাতে কী প্রমাণিত হয়?'

বিমূঢ়ের মতো মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন. 'কী?'

'আমার ইনএফিসিয়েন্সি। এরপর আমার চাকরিটা কি আর থাকবে?'

মল্লিনাথ জানেন, এই কারণে কারো চাকরি যায় না। বিশেষ করে সুকুমারের মতো জার্নালিস্ট যে কোনো কাগজের পক্ষেই অ্যাসেট। যাই হোক, ছেলেটার কথা বলার ভঙ্গি এবং কথায় চমৎকার। টেনসানের মধ্যেও মজাই পাচ্ছিলেন মল্লিনাথ। বলেন, 'এবার যেভাবেই হোক, আপনাকে খানিকটা সময় দেবো।'

'আমার একটা আর্জি আছে স্যর।'

'বলুন।'

সুকুমার শুরু করার আগেই হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে দেয়। কখন কথায় কথায় আর প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপের মধ্যে তিন মিনিট কেটে গেছে, টের পাওয়া যায় নি। বিশাল সরীসৃপের মতো বম্বে মেল ধীরে ধীরে লম্বা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে।

অবিনাশ মণিকাকে নিয়ে না আসায় অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন মল্লিনাথ। একজন তুখোড় সাংবাদিকের কাছে মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে ধরা পড়তে হল না, স্ক্যাণ্ডালের হাত থেকে তিনি বেঁচে গেলেন। আপাতত এটুকুই মন্দের ভাল। কিন্তু ওরা কেন এল না, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এই ট্রেনে অন্য কোনো কামরায় অবিনাশ যখন আছে, নিশ্চয়ই একসময় তাঁর কাছে হাজির হবে। তখনই সব জানা যাবে।

স্নায়বিক চাপ কমে যাওয়ায় মল্লিনাথের চোখমুখ বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, 'ট্রেন ছেড়ে দিল। আপনি তো নামলেন না।'

সুকুমার বলে, 'কোনো সমস্যা নেই স্যার। আপনাকে তো আগেই বলেছি আমাদের ডেস্টিনেসান একই। পরের কি তারপরের স্টেশনে নেমে গেলেই হল। আশা করি ততক্ষণ আপনার কুপেতে থাকার পারমিসান দেবেন।'

এখন আর সুকুমারকে চলে যেতে বলা যায় না। চলন্ত ট্রেনে যাবেই বা কোথায়? অবশ্য কুপের বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পরের স্টেশন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলা যায়। কিন্তু সেটা চরম অভদ্রতা হয়ে যাবে। তা ছাড়া প্রেস মীডিয়াকে চটানোর যথেষ্ট বিপদ। কখন কী লিখে ক্ষতি করে দেবে, তার কি কিছু ঠিক আছে? মল্লিনাথ বলেন, 'পারমিসানের কিছু নেই। আপনার কম্পানি পেলে আমার ভাল লাগবে।'

'থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ।'

মল্লিনাথ সামান্য হাসেন। সুকুমার সম্পর্কে এবার প্রথম তিনি কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হ'ন। বলেন, 'বম্বে যাচ্ছেন কি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে?'

সুকুমার বলে, 'না স্যার। জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানুয়াল কনফারেন্স হচ্ছে এবার বম্বেতে। সেই ব্যাপারেই আমরা যাচ্ছি।'

'আমরা বলতে?'

'কলকাতার অনেক জার্নালিস্ট আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার। তারাও সঙ্গে চলেছে।'

খবরটা ভীষণ অস্বস্তিকর। এতগুলো সাংবাদিক যদি টের পায় তিনি এই ট্রেনে বম্বে যাচ্ছেন, একেবারে ঝাঁক বেঁধে এসে হানা দেবে। গোপনে প্রমোদ ভ্রমণের যে ছকটা করা হয়েছিল তার আর আশা নেই। অবিনাশের সঙ্গে দেখা হলেই জানিয়ে দেবেন, মেয়েটাকে কোনোভাবেই যেন এই কুপেতে না নিয়ে আসে। সাংবাদিকরা গোয়েন্দাদের চেয়েও মারাত্মক। তাদের চোখ-কান ভয়ানক ধারাল। সামান্য ফিসফিসানি শুনে কিংবা আবছাভাবে কিছু একটা দেখে তারা আসল বিষয় চট করে ধরে ফেলে। ঘুণাক্ষরেও যাতে তারা মেয়েটার ব্যাপার টের না পায় সেজন্য সারাক্ষণ স্নায়ুগুলোকে টান টান করে রাখতে হবে। এই তিরিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত একটা দম-চাপা উৎকণ্ঠার মধ্যে তার কাটবে।

মল্লিনাথ বলেন, 'আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে মিস্টার সান্যাল।'

ব্যস্তভাবে সুকুমার বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি যে এই ট্রেনে বম্বে যাচ্ছি, অনুগ্রহ করে আপনার জার্নালিস্ট ফ্রেণ্ডদের এ খবরটা দেবেন না। বুঝতেই তো পারছেন—'

'নিশ্চয়ই পারছি। তা হলে ওরা আপনার এই রেল ভ্রমণটির বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন খবরটা কাউকে দিচ্ছি না। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনাকে আমার এক বন্ধু দূর থেকে আপনাকে দেখেছে। হী ইজ নট মাচ সার্টেন। ভাল করে চিনতে না পারলেও আন্দাজ করেছে, হয়ত আপনিই হবেন। ইন ফ্যাক্ট ওর কাছ থেকে হিন্টস পেয়েই আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। অ্যাণ্ড আই ডিসকভারড ইউ।'

'আপনার ফ্রেণ্ড নিশ্চয়ই জার্নালিস্ট।'

'হ্যাঁ।'

'অন্য জার্নালিস্টদের তিনি কি আমার কথা এর ভেতর বলে ফেলতে পারেন?'

একটু চিন্তা করে সুকুমার বলে, 'আই ডোন্ট থিংক সো।

মিস্টার চৌধুরী, আপনার মতো একজন পার্সোনালিটিকে নিয়ে সেনসানাল নিউজ হতে পারে। নিজের কাগজের জন্যে সব জার্নালিস্টই সেটা এক্সক্লুসিভ রাখতে চাইবে। চাইবে সবার আগে তা ছাপাতে। প্রফেসানাল কমপীটিসান আর কী।'

মল্লিনাথ বলেন, 'তা হলে আপনার বন্ধুটি আপনাকে আমার কথা বলেছেন যে?'

'আমার সঙ্গে ওর রিলেশানটা অন্যরকম। তা ছাড়া আমাদের কাগজটা ডেইলি আর ওর কাগজটা ফোর্টনাইটলি। ও নিউজ করার আগে আমার রিপোর্ট বেরিয়ে যাবে। এনিওয়ে, আমার ধারণা, আমার ফ্রেণ্ডটি গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে এসে হাজির হবে।' সুকুমার বলতে থাকে, 'যদি আপনাকে খুঁজে বার করতে না পারে, আমি তাকে হেল্প করব।'

মল্লিনাথ উদ্বিগ্ন মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দেয় সুকুমার, 'প্লিজ চৌধুরীসাহেব, আমাকে শেষ করতে দিন। আমাদের মধ্যে পারফেক্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে, একজন আরেক জনকে প্রফেসানাল ব্যাপারে সাহায্য করি।'

হাওড়া লিলুয়া ইত্যাদি পেছনে ফেলে ট্রেন হু হু করে ঝড় তুলে ছুটে যাচ্ছে। জানালার কাচের ভেতর দিয়ে আলোর একেকটি রেখা বিদ্যুৎগতিতে পেছনে সরে সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কারখানা, ছোটখাটো শহর, তারপরেই ফাঁকা অন্ধকার মাঠ। আকাশে অগুনতি তারা জরির ফুলের মতো ফুটে রয়েছে। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, খুব সম্ভব কৃষ্ণপক্ষ চলছে।

বাইরের কোনো কিছুই দেখছিলেন না মল্লিনাথ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার বন্ধুর কী নাম?'

'তরুণ দত্ত।'

'কোন কাগজে কাজ করেন?'

পাক্ষিক দেশকাল।'

মল্লিনাথ চমকে ওঠেন। এই পত্রিকাটির কথা তিনি খুব ভালই জানেন। মাঝে মাঝে দু-চার কপি তাঁর চোখেও পড়েছে। ইওরোপ আমেরিকার সেনসেসানাল রঙিন ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনের আদলে এই কাগজটা বার করা হয়েছে। ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের

নামে বেশির ভাগই নাম-করা লোকেদের স্ক্যাণ্ডাল বা কেচ্ছা ছাপা হয়েছে এই সব ট্যাবলয়েডে, সেই সঙ্গে বিকিনি আর ব্রা-পরা মেয়েদের নির্লজ্জ অশ্লীল সব ছবি। সেক্স ভায়োলেন্স আর নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি ছাড়া এরা আর কিছু ভাবতেই পারে না।

এই ট্রেনে সেই মেয়েটি রয়েছে। পুরনো দুশ্চিন্তা আর টেনসান ফের মল্লিনাথের মাথায় ফিরে আসে। ফোর্টনাইটলি 'দেশকাল'-এর সংবাদিকটি যদি কোনোরকমে তার হদিস পেয়ে যায় তার ফলাফল কী হতে পারে, চোখের সামনে তার একটা পরিষ্কার ভিসুয়াল যেন দেখতে পান তিনি। যেভাবেই হোক, মণিকার ফোটো তারা জোগাড় করবেই। মল্লিনাথ শুনেছেন, দরকার মতো একজনের মাথার সঙ্গে আরেকজনের ন্যুড বডি জুড়ে এরা ছেপে দিতে পারে। মণিকার এরকম একটা ছবির পাশে যদি তাঁর ফোটো দিয়ে একটা রগরগে স্টোরি ওরা বানিয়ে দেয়? পরে ডিফেমেসানের ক্ষতিপূরণ চেয়ে কোটি টাকার কেস হয়ত করা যাবে কিন্তু তার আগে সর্বনাশ যা হবার হয়ে যাবে। স্ক্যাণ্ডালের দুর্গন্ধ সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে।

সুকুমার বলে, 'ওসব কথা থাক। আমার আর্জিটা এবার শুনুন।'

ক্লান্ত গলায় মল্লিনাথ বলেন, 'বলুন—'

'তিরিশ ঘণ্টা আপনাকে এই ট্রেনে পাচ্ছি। আমার সঙ্গে একটা টেপ রেকর্ডার আছে। কাইন্ডলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আপনি বলে যাবেন। একটানা বলতে হবে না। ভেবে-চিন্তে, রেস্ট নিয়ে একটু একটু করে বললে আমার কাজটা হয়ে যাবে।' বলে উৎসুক চোখে তাকায় সুকুমার।

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে। তবে আমি আজ ভীষণ টায়ার্ড। পরে ভেবে দেখব কী করা যায়।'

'আপনাকে আজ বিরক্ত করব না। কাল সারাদিন আছে। রাতে শোবার আগেও অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। স্যার, না বলবেন না। আপনার কাছে এই কো-অপারেশনটুকু আশা করছি। আপনার মতো বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সাহায্য পেলে চাকরির দিক থেকে আমার খুব উপকার হবে। হোল লাইফ

আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

মল্লিনাথ বুঝতে পারেন, কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য সূক্ষ্মভাবে চাটুকারিতাই করছে সুকুমার। তোষামুদির একটা মোহ অবশ্যই আছে কিন্তু এখন তা উপভোগ করার মতো সময় নয়।

মল্লিনাথ বলেন, 'আজকের রাতটা তো কাটতে দিন।'

সুকুমার যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সে জানে এরপর আর বেশি লেবু কচলাতে নেই। বলে, 'ঠিক আছে স্যর। আজ আপনি রেস্ট নিন। কাল কখন দেখা করলে আপনার অসুবিধে হবে না?'

এই নাছোড়বান্দা টাইপের জার্নালিস্টদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। কিছু না ভেবেই মল্লিনাথ বলেন, 'আসবেন দশটা সাড়ে দশটার পর।'

'থ্যাংক ইউ স্যর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

মল্লিনাথ উত্তর দেন না।

ট্রেন পরের স্টেশনে থামে। আজকের মতো বিদায় নিয়ে চলে যায় সুকুমার।

মল্লিনাথ অনেকখানি আরাম বোধ করেন। অন্তত আজকের রাতটা তিনি নিরাপদ। আশা করা যায়, সাংবাদিকরা কেউ হানা দেবে না। কাল দশটায় যদি সুকুমার আসে কিছু একটা অজুহাত খাড়া করে তাকে বিদায় করবেন। কিন্তু কী হল অবিনাশের?

প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মল্লিনাথের মনে পড়ে যায়, সুকুমারের মতো আবার কেউ তাঁকে দেখে ফেলতে পারে। তাঁকে চেনে, এমন লোকের সংখ্যা ইণ্ডিয়ায় কম নেই। না, ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। এখনও তিনি জানালার দিকে মুখ করেই বসে আছেন। ঝুঁকির কথাটা মনে পড়ায় দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বসেন। কেননা, এই স্টেশনই তো শেষ স্টেশন নয়। সবে শুরু। এরপর সেই বম্বে পর্যন্ত আরো অনেক স্টেশন পড়বে। এখন যেভাবে মল্লিনাথ বসেছেন সেভাবে বসে থাকলে আর যাই হোক, প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে কারো পক্ষে শরীরের পেছন দিকটা দেখে তাঁকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে না।

ধরা পড়ার দুর্ভাবনাটা না হয় আপাতত কাটল কিন্তু অবিনাশরা কোথায় উধাও হল? এই স্টেশনে বেশ খানিকক্ষণ

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। এর ভেতর সে তো আসতে পারত। এতক্ষণ মল্লিনাথের ছিল দুশ্চিন্তা আর টেনসান, সেই সঙ্গে নতুন করে যোগ হল বিরক্তি।

এক সময় ট্রেন ছেড়ে দেয়। অবিনাশের আশা যখন মল্লিনাথ প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন সেই সময় দেখা গেল কুপের খোলা দরজার চৌকো ফ্রেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে।

দুই

'আসছি স্যর—'বলে দরজা বন্ধ করে মল্লিনাথের সামনে এসে দাঁড়ায় অবিনাশ।

আঙুল দিয়ে সামনের একটা বার্থ দেখিয়ে দেন মল্লিনাথ।

কুণ্ঠিতভাবে বসতে বসতে অবিনাশ বলে, 'স্যর, অপরাধ যদি না নেন একটা কথা বলব।'

ভুরু সামান্য তুলে মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'এভাবে কুপের দরজা খুলে রাখা ঠিক হয়নি। একটা খবর নিশ্চয়ই আপনার জানা নেই।'

'কী খবর?'

এই কম্পার্টমেন্টের ডান দিকের শেষ কুপেটায় রয়েছেন রাজিন্দর বাজপেয়ী।'

মল্লিনাথ চকিত হয়ে ওঠেন, 'কোন রাজিন্দর বজেপেয়ী? গলফার?'

অবিনাশ বলে, 'হ্যাঁ, স্যর।'

রাজিন্দর স্টক এক্সচেঞ্জের ভাইস প্রেসিডেন্ট। একজন বড় বিজনেসম্যান এবং চ্যাম্পিয়ান গলফ প্লেয়ার। তিনি মল্লিনাথের অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। গলফের দারুণ শখ মল্লিনাথেরও। ঠাসা রুটিনের মধ্যে সময় করে মাঝে মধ্যে গলফের স্টিক নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। রাজিন্দর আর মল্লিনাথ একই ক্লাবের মেম্বার।

সুকুমারের পর রাজিন্দর। সুকুমার তবু অন্য কম্পার্টমেন্টে

রয়েছে, আর রাজিন্দর একেবারে ঘাড়ের ওপরে চড়ে আছেন। যে স্নায়বিক চাপটা খানিক আগে কমে গিয়েছিল আবার সেটা ভয়ঙ্কর বেড়ে যায়। রাজিন্দর কোনো কারণে সামনের প্যাসেজ দিয়ে গেলে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখে ফেলতেন এবং নিজের ব্যাগট্যাগ নিয়ে সটান এই কুপেতে আসতেন বা পুরো সফরটার বেশির ভাগ সময় এখানেই কাটিয়ে দিতেন। শেষ স্টেশন অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া টারমিনাস পর্যন্ত তাঁর গায়ে আঠার মতো জুড়ে থাকতেন।

কোনোরকম কুসংস্কার নেই মল্লিনাথের। হাঁচি টিকটিকি রাশি লগ্ন গ্রহ নক্ষত্র যাত্রা-অযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে কখনও মাথা ঘামান না। তবু এই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়, আজ বোধ হয় কুক্ষণেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।

নিচু গলায় অবিনাশ বলে, 'বাজপেয়ীজি দেখে ফেললে ভীষণ ঝামেলা হত স্যর।'

বাজপেয়ী নিজের রুগ্ন স্ত্রী সম্পর্কে যতটা উদাসীন, ঠিক ততটাই আগ্রহী অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে তারা যদি হয় রূপসী, তরুণী এবং ঝকঝকে আধুনিকা। বাজপেয়ী কোথাও বেরুলে তাঁর সঙ্গে দুর্দান্ত একটি সঙ্গিনী থাকবে না—এটা ভাবাই যায় না। এ ব্যাপারে তাঁর ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। মেয়েমানুষ ছাড়া মদ এবং রেস নিয়েও তাঁর সমান মাতামাতি।

রাজিন্দর জানেন মল্লিনাথ ঘোর মোরালিস্ট। একেবারে নিষ্কাম ব্রহ্মচারী জাতীয় জীব। মল্লিনাথের সঙ্গে মণিকাকে তিনি কোনোভাবে দেখে ফেললে কী হতে পারে সেটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। আস্তে আস্তে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে মল্লিনাথ শুধু মাথা নাড়েন।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করে, 'আমি যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। ওটা খুলে গেল কী করে?'

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মল্লিনাথ বলেন, 'আসবে বলে সেই যে চলে গেলে তারপর আর তোমার পাত্তা নেই। কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মেয়েটাই বা কোথায়?'

অবিনাশ জানায়, মেয়েটি অর্থাৎ মণিকাকে নিয়ে সে ট্রেন ছাড়ার

আগে এই কুপেতে আসছিল। হঠাৎ দেখতে পায় ভেতরে সুকুমার বসে আছে। তক্ষুণি মণিকাকে সঙ্গে করে কামরা থেকে নেমে যায়। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে ফের দু'জনে এসেছিল কিন্তু সুকুমার তখনও চলে যায় নি। সে তো ছিলই, তার ওপর প্যাসেজের শেষ মাথায় রাজিন্দর বাজপেয়ীকেও দেখতে পেয়েছিল অবিনাশ। এমন বিপজ্জনক অবস্থায় মণিকাকে মল্লিনাথের কুপেতে পেঁছে দেওয়া সমীচীন মনে হয় নি। অগত্যা মেয়েটাকে ফের ফার্স্ট ক্লাসের সেই সীটটায রেখে নিজের কামরায় চলে যায় সে।

অবিনাশেব প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাই বোধ করেন মল্লিনাথ। তবে বাইরে তা প্রকাশ করেন না। বলেন, 'বাজপেয়ীকে তুমি যে চেনো, সেটা আমার জানা আছে। সুকুমারকে চিনলে কী করে?'

অবিনাশ বলে, 'সব টাইপের লোকের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতে হয় স্যর। কখন কে কাজে লাগবে, আগে থেকে তো বোঝা যায় না। যদি পারমিসান দেন, একটা কথা বলি—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল।'

'ধরুন, আপনার নামে কোনো কাগজে একটা স্ক্যাণ্ডাল বেরুবার তোড়জোড় হচ্ছে, আমি খবরটা পেয়ে গেলাম। সেটা যাতে কোনো-ভাবেই ছাপা না হয় তার ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'জার্নালিস্টদের সঙ্গে জানাশোনা ভাব-ভালোবাসা থাকলে কাজটা আমার সিম্পল হয়ে যায় না?'

অবিনাশ লোকটা যে নিখুঁত প্রফেসানাল এবং দূরদর্শী, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কাজ করে থাকে, আরেক বার তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে মনে অবিনাশকে তারিফ করতে করতে বলেন, 'রাইট, রাইট। আচ্ছা অবিনাশ—'

'বলুন স্যর—' অবিনাশ উৎসুক চোখে মল্লিনাথের দিকে তাকায়।

'তুমি কি কলকাতার সব জার্নালিস্টকে চেনো?'

'সবাইকে নয়। তবে প্রত্যেক কাগজের দু-একজনের সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিয়েছি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর চাপা গলায় খানিকটা উত্তেজনা মিশিয়ে অবিনাশ বলে, 'একটা খারাপ খবর পেলাম স্যর।'

মল্লিনাথকে চিন্তিত দেখায়, 'কী খবর অবিনাশ?'

'এই ট্রেনে কলকাতার তিরিশ-চল্লিশজন জার্নালিস্ট বম্বে যাচ্ছেন।'

'জানি। সুকুমার বলেছে।'

'ওদের মধ্যে দু-চারটে বাজে লোক আছে। তারা ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিন চালায়। কেচ্ছা ঘাঁটা, মানে ইয়েলো জার্নালিজম—'

হাত তুলে অবিনাশকে থামিয়ে দিতে দিতে মল্লিনাথ বলেন, 'জানি। ওদের একজনের কথা সুকুমারের কাছে শুনেছি।'

অবিনাশ বলে, 'আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে স্যর।'

এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সায় আছে মল্লিনাথের। আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন তিনি, মুখে কিছু বলেন না।

ট্রেন প্রচণ্ড স্পীড তুলে গাঁ গাঁ আওয়াজে দু'ধারের মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র এবং গ্রামগঞ্জকে হকচকিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে অবিনাশ। বলে, 'স্যর, ন'টা বাজে। আপনার ডিনারের সময় হয়েছে। টয়লেটে যাবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে আস্তে উঠে পড়েন মল্লিনাথ। তাঁর ডান পাশে টয়লেট। দরজা ঠেলে ভেতরে চলে যান।

মিনিট কুড়ি পঁচিশ বাদে স্নানটান সেরে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে টয়লেটের বাইরে এসে মল্লিনাথ দেখেন, সুদৃশ্য গ্লাসে হুইস্কির ওপর বরফের কিউব দিয়ে ড্রিংক তৈরি করছে অবিনাশ। একটা প্লেটে কিছু কাজুবাদাম, অন্য এক প্লেটে অনেক-গুলো ফিশ ফিঙ্গার।

রোজ ডিনারের আগে দু পেগ হুইস্কি খান মল্লিনাথ। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হিসেবে কাজের চাপ এবং টেনসান বাড়ার পর থেকে ড্রিংকটা ধরেছেন তিনি। মাতাল হবার জন্য নয়। পিউরিটান টীটোটেলার স্কুলমাস্টার বাবার ঔরসে যাঁর জন্ম সেই মল্লিনাথের চরিত্রটি ছেলেবেলা থেকেই এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যে লাগাম-

ছাড়া নেশায় চুর চুর হয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

সারাদিন একটানা কাজের পর ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর যখন ভেঙে আসে, মনে হয় মাথা তুলে আর দাঁড়াতে পারবেন না তখন দু পেগ হুইস্কি তাঁর রক্তে এবং মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি চারিয়ে দেয়। তা ছাড়া অনুরাধাকে নিয়ে তাঁর যে বিবাহিত জীবন সেখানেও রীতিমত জট রয়ে গেছে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। মনে হবে সব কিছুই স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ কিন্তু ভেতরে ভেতরে সম্পর্কটা ঠিক নেই, বহুকাল আগেই সেখানে ক্ষয় ধরে গেছে। এ সব কথা পরে।

অফিস, চেম্বার অফ কমার্স বা বড় রকমের কনফারেন্স সেরে বাড়ি ফিরে অনুরাধাকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকার জন্যও হুইস্কিটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

এক পেগ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যেই আরেক পেগ তৈরি করে ফেলেছে অবিনাশ। দ্বিতীয় পেগটি মল্লিনাথের সামনে রেখে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে একধারে দাঁড়িয়ে থাকে সে। পারতপক্ষে অবিনাশ মল্লিনাথের সামনে বসে না। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য যে আকাশপাতাল সে সম্পর্কে সে সচেতন।

দু পেগ হুইস্কি খেতে মল্লিনাথের সময় লাগে মিনিট কুড়ি। দ্বিতীয় পেগটি যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় ন্যাপকিন প্লেট ফর্ক চামচ ইত্যাদি ধুয়ে একধারে রাখে অবিনাশ। গোটা চারপাঁচেক হট কেসে প্রচুর খাবার-দাবার নিয়ে আসা হয়েছে। মল্লিনাথের মতো খাবার বার করে ছোট বড় নানা প্লেটে সাজিয়ে দেয় অবিনাশ।

দু নম্বর পেগটি শেষ করার পর আর দেরি করেন না মল্লিনাথ, খাওয়া শুরু করেন। মণিকা এবং তাঁর একসঙ্গে বসে আজ ডিনার করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে একাই খেতে হচ্ছে।

যে খাবার সঙ্গে করে আনা হয়েছে, আজকের ডিনার তো বটেই, কাল লাঞ্চ পর্যন্ত চলে যাবে। নাগপুরের একটা নাম করা হোটেলে ট্রাঙ্ককলে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কালকের ডিনারের ব্যবস্থা ওরাই করবে। কাল সন্ধের আগে আগে ট্রেন যখন নাগপুর পৌঁছুবে, হোটেলের লোক এসে খাবারের প্যাকেট দিয়ে যাবে।

তারপর দিন খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নেই। ভোর হতে না হতে বম্বে মেল শেষ স্টেশন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে পেঁছে যাবে।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে অবিনাশ বলে, 'আমার একটা কথা ছিল স্যার।'

'কী কথা?' খেতে খেতে মুখ তোলেন মল্লিনাথ।

'মণিকাকে এখানে আনা ঠিক হবে না। মানে—' বলতে বলতে থেমে যায় অবিনাশ।

কারো মনের কথা আগে থেকে জেনে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা আছে লোকটার। এই ব্যাপারটাই ভেবে রেখেছেন মল্লিনাথ। তিনি বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। ভেরি গুড সাজেসান। কে কখন দেখে ফেলবে, তারপর এই নিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট! নতুন প্রবলেম জুটিয়ে কী লাভ?'

অবিনাশ উত্তর দেয় না।

মল্লিনাথ একটু চিন্তা করে বলেন, 'তা হলে—'

তাঁর অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে যে ইঙ্গিতটা ছিল চট করে তা ধরে ফেলে অবিনাশ। বলে, 'একেবারে বম্বে গিয়েই মণিকার সঙ্গে দেখা হবে।'

মল্লিনাথ সামান্য হাসেন। সে হাসিতে কিঞ্চিৎ হতাশা মেশানো। অনেকটা নিজের মনেই বলেন, 'রিস্ক না নেওয়াই ভাল।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'বম্বেতে আমি তো ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে থাকছি। মেয়েটাকে ওখানে নিয়েই তুলবে নাকি?'

ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল-এ মল্লিনাথের জন্য স্যুইট বুক করা হয়েছে। অবিনাশ তা জানে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'না স্যার, তা-ই কখনও পারি? বম্বের প্রেস আপনার মতো টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সম্বন্ধে খুবই ইন্টারেস্টেড। তা ছাড়া ওখানে ইয়েলো জার্নালিজমটা কলকাতার তুলনায় এক শ গুণ বেশি। এদিকে কলকাতার প্রেস তো সঙ্গেই চলেছে। তাই মণিকাকে প্রপার সিটির ধারে কাছে রাখি নি। ওর থাকার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি জুহুতে।'

'কোনো হোটেলে?'

'না। একটা চমৎকার গেস্ট হাউসে। খবরের কাগজের লোকেরা

দশ বছর চেষ্টা করলেও ওটা খুঁজে বার করতে পারবে না।'

অবিনাশের সমস্ত পরিকল্পনাটাই নিখুঁত, ফুল-প্রুফ। মল্লিনাথ জানেন, এই লোকটা শুধু কলকাতা না, ইন্ডিয়ার সব বড় বড় মেট্রোপলিসের খবর রাখে। কোথায় কোন হোটেল, কোথায় কোন গেস্ট হাউস, সব তার মুখস্থ। মল্লিনাথ বেশ খুশিই হন। জিজ্ঞেস করেন, 'সবার চোখে ধুলো না হয় দেওয়া যাবে। থাকার ব্যবস্থা ভাল তো? মেয়েটার অসুবিধে হবে না?'

'একেবারেই না স্যার। গেস্ট হাউস হলে কী হবে, পুরোটা এয়ারকনডিশানড। এমন কি সুইমিং পুল পর্যন্ত আছে। ফাইভ স্টার হোটেলের সবরকম কমফোর্ট ওখানে পাওয়া যায়।' বলতে বলতে একটু থামে অবিনাশ, তারপর ফের শুরু করে, 'মণিকা বম্বে এসে কোথায় থাকবে, সেটা ঠিক করার সময় একটা ব্যাপার আমাকে মাথায় রাখতে হয়েছে।'

'কী সেটা?'

'আপনিও সেখানে যাবেন। সাব-স্ট্যান্ডার্ড কোনো জায়গায় তো তাকে তোলা যায় না।'

মল্লিনাথ একটু হাসেন শুধু, উত্তর দেন না।

ডিনার শেষ হবার পর অবিনাশ এঁটো প্লেট টেট্রট ধুয়ে জায়গা-মতো রেখে দেয়। টয়লেট থেকে স্লিপিং গাউন এনে মল্লিনাথের পাশে রাখতে রাখতে বলে, 'পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে আমি নেমে যাব স্যার। এই ট্যাবলেটগুলো খেয়ে নিন।' বলে একটা প্লেটে ওষুধ এবং কাচের গেলাসে জল এনে দেয়।

ট্যাবলেট খেয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে মল্লিনাথ বলেন, 'আমি তো ভালই ডিনার করলাম। তোমাদের খাওয়ার কী হবে? এক কাজ কর, হট কেসে যা খাবার আছে, নিয়ে যাও।'

'তার দরকার হবে না স্যার।'

মল্লিনাথ জিজ্ঞাসু চোখে অবিনাশের দিকে তাকান।

অবিনাশ বলে, 'স্যার, হাওড়ায় সুকুমার সান্যালকে আপনার কুপেতে দেখে, নেমে গিয়েই রেলওয়ে কেটারিংয়ে দু'জনের মতো ডিনারের অর্ডার দিয়েছি। খাবার এসে গেছে। মণিকাকে খেতে বলে এসেছি। নেক্সট স্টেশনে নেমে আমি গিয়ে খাব।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে বিছানা ঠিক করে পেতে দেয় অবিনাশ।

একসময় ট্রেন পরের স্টেশনে থামে।

'গ্ড নাইট স্যর। কাল সকালে আবার আমি আসছি।' বলে কুপের দরজা টেনে দিয়ে চলে যায় অবিনাশ।

তিন

রাতে ডিনারের পর মল্লিনাথ যে সব ট্যাবলেট খান সেগ্লো তাঁর রক্তচাপ স্বাভাবিক তো রাখেই, ক্লান্ত বিপর্যস্ত স্নায়্মণ্ডলীকে সতেজও করে তোলে। একটা ট্যাবলেটে সিডেটিভ মেশানো আছে। সেটা চমৎকার ঘ্ম এনে দেয়।

কাল রাতে শোবার পর যে জয়েন্ট ভেনচার ফাইনাল করতে বম্বে যাওয়া তার কথা একবারও ভাবেন নি মল্লিনাথ। তাঁর চিন্তার ধারে কাছে অন্রাধা, তাঁদের বম্বের অফিস এবং তার অন্যান্য সমস্যা—এ সব কিছ্ই ছিল না। যাঁকে তিনি কখনও দেখেন নি সেই মণিকার একটি কাল্পনিক ছবি চোখের সামনে ফ্টিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কেমন দেখতে মেয়েটাকে? অবিনাশ তো বলেছে চার্মিং। কতটা চার্মিং, কতটা স্ন্দর? এত সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘ্মিয়ে পড়েছিলেন, মনে পড়ে না মল্লিনাথের।

সিডেটিভের ঘোরটা থাকে ঘণ্টা ছয়েকের মতো। সকালে যখন মল্লিনাথের ঘ্ম ভাঙে ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে পাঁচটা। এখনও রোদ ওঠে নি। জানালার কাচের বাইরে, অনেক দ্রে আকাশের গায়ে আবছা আলোর ছোপ ধরেছে। মিহি সিল্কের মতো কুয়াশা দিগন্তের গায়ে আলতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

বম্বে মেল ঊর্ধ্বশ্বাসে এখন ছ্টে চলেছে। গাছপালা, টেলিগ্রাফের তার, মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র—সমস্ত কিছ্ চকিতে চোখের সামনে থেকে সরে সরে যাচ্ছে। বালিশের ওপর থ্তনি রেখে বাইরের দ্রত বদলে-যাওয়া দৃশ্যাবলী দেখতে খ্ব ভাল লাগছিল

মল্লিনাথের। এই মুহূর্তে কোনোরকম স্নায়বিক চাপ বা টেনসান অনুভব করছেন না তিনি। একটানা নির্বিঘ্ন ঘুমের পর শরীরও বেশ ঝরঝরে লাগছে।

গাছপালা, আকাশ, পাখি, অদিগন্ত মাঠ, ইত্যাদি মিলিয়ে প্রকৃতির নিজস্ব একটা ম্যাজিক রয়েছে। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল মল্লিনাথের।

একসময় দিগন্তের তলা থেকে সূর্য উঠে আসে। কখন কুয়াশা কেটে গেছে, লক্ষ করেন নি মল্লিনাথ। চোখের সামনের ছুটন্ত দৃশ্যপট গলানো গিনির মতো নরম রোদে ঝলমল করছে।

ধীরে ধীরে উঠে টয়লেটে চলে যান মল্লিনাথ। শেভ করে মুখ ধুতে ধুতে টের পান, গাড়ির স্পীড কমে আসছে। নিশ্চয়ই সামনে কোনো স্টেশন আছে।

টয়লেট থেকে বেরুতে না বেরুতেই বম্বে মেল বিলাসপুরে এসে থামে। কাচের জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে প্রচণ্ড ব্যস্ততা চোখে পড়ে। প্যাসেঞ্জার এবং কুলীদের ছোটাছুটি, সেই সঙ্গে 'সমোসা', 'চা গরম', 'পুরীভাজি', 'কেলা' নিয়ে ট্রেনের কামরায় কামরায় হকারদের হানা, ইত্যাদি। এরই মধ্যে ভিড় ঠেলে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে অবিনাশকে আসতে দেখা যায়। তার দুই কাঁধে দুটো ফ্লাস্ক, এক হাতে বড় একটা প্যাকেট, অন্য হাতে খবরের কাগজ। বোঝা যায়, সে এই কামরাতেই আসছে।

কুপের দরজা অল্প খুলে রাখেন মল্লিনাথ। একটু পর ভেতরে ঢুকে দরজা টেনে বন্ধ করে দেয় অবিনাশ। রেলওয়ে কেটারিং থেকে চা এবং ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছে সে। প্লেটে টোস্ট ডিম কলা, বড় 'বোলে' কর্নফ্লেকস দুধ সাজিয়ে দিতে দিতে বলে, 'স্যর, 'বিদর্ভ টাইমস'-এ একটা দারুণ খবর বেরিয়েছে।' উৎসাহে তার চোখমুখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

যদিও কৌতূহল হচ্ছিল, তবু বেশ শান্ত গলায় মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'খবরটা কী?'

অবিনাশ বলে, 'মিসেস চৌধুরীর ব্যাপারে—'

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেন না মল্লিনাথ। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু একটা খেলে যায়। তিনি

বলেন, 'তুমি কি আমার স্ত্রী অনুরাধা সম্পর্কে কিছু বলছ?'

অবিনাশ বলে, 'হ্যাঁ, স্যার—'

অনুরাধা সম্পর্কে মাঝে মাঝেই কাগজে নানারকম খবর আর তাঁর ইন্টারভিউ বেরোয়। শুধু পত্র-পত্রিকাই নয়, রেডিও টিভিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মিডিয়ার দিক থেকে অনুরাধার চাহিদা মল্লিনাথের থেকে অনেক বেশি। তাঁর চেয়ে ঢের বেশি মানুষ অনুরাধাকে চেনে আর যথেষ্ট সম্মানও করে থাকে। দেশের মানুষের কাছে তাঁর বিরাট ইমেজ। যারা অনুরাধাকে চেনে তাদের মনে তিনি দেবীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

ঔৎসুক্য বা ভাবাবেগকে একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন মল্লিনাথ। সংযত গলায় বলেন. 'কাগজটা রেখে যেও। পরে দেখে নেবো।'

'আচ্ছা স্যার।' যত্ন করে 'বিদর্ভ টাইমস'-এর কপিটা মল্লিনাথের পাশে রেখে দেয় অবিনাশ।

দুধে কর্নফ্লেকস মেশাতে মেশাতে মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'এই স্টেশনে ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়ায়?'

অবিনাশ জানত না, একটু বিব্রতভাবে বলে, 'ঠিক বলতে পারব না স্যার। মনে হয় মিনিট দশেক।'

বাইরে যতই শান্ত এবং সংযত থাকতে চেষ্টা করুন, আসলে অনুরাধার খবরটা পড়ার জন্য ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বোধ করছিলেন মল্লিনাথ। এই মুহূর্তে অবিনাশ বা অন্য কেউ কুপেতে থাক, তাঁর কাছে তা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কলকাতা থেকে এতদূরে 'বিদর্ভ টাইমস'-এর মতো অতি সাধারণ একটি কাগজে যখন অনুরাধার খবরটা বেরিয়েছে তখন সেটা খুব মামুলি ব্যাপার নয়। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ না হলে এ জাতীয় স্থানীয় কাগজে বাইরের খবর ছাপা হয় না।

মল্লিনাথ বলেন, 'তা হলে আর দেরি ক'রো না। আমার ওষুধগুলো বার করে দিয়ে চলে যাও।'

মল্লিনাথের কণ্ঠস্বরে এমন এক প্রভুত্ব রয়েছে যা অমান্য করা অসম্ভব। শশব্যস্তে সে বলে, 'আচ্ছা স্যার—' বলে মল্লিনাথ সকালে যে সব ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল খান সেগুলো গুছিয়ে

দিয়ে বাইরের প্যাসেজে গিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়।

মল্লিনাথ ব্রেকফাস্টের কথা ভুলে যান। একরকম ব্যগ্রভাবেই 'বিদর্ভ টাইমস'টা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে গভীর আগ্রহে অনুরাধার খবরটার জন্য ঝুঁকে পড়েন। ডানদিকে মাঝামাঝি জায়গায় তিন কলম জুড়ে অনুরাধার বড় ছবির তলায় বিরাট রিপোর্ট। কলকাতার ফুটপাথবাসী, যারা দুরারোগ্য অসুখে ভুগছে তাদের নিঃস্বার্থভাবে সেবার জন্য এ বছর ম্যাগসেসে পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে অনুরাধাকে। কিভাবে পনের ষোল বছর আগে তিনি এই সেবাব্রতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং অসংখ্য বাতিল মানুষকে নতুন জীবন দিয়েছেন তার বিশদ বিবরণ রয়েছে রিপোর্টটিতে। শুধু কলকাতার ফুটপাথ বাসিন্দাদের জন্যই নয়, মধ্যপ্রদেশ ওড়িষা এবং বিহারে অনাথ শিশু আর পরিত্যক্ত নারী এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুরাধা যে ক'টা হোম করেছেন এবং তাদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে নানারকম হাতের কাজ শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, সে সব খবরও প্রতিবেদনটিতে পাওয়া যাচ্ছে। বোঝা যায়, যে সাংবাদিক এই রিপোর্টটা তৈরি করেছে, অনুরাধা সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি তার জানা। আসলে অনুরাধাকে নিয়ে ভাল রিসার্চ করেছে সে।

রিপোর্টটার নিচেব দিকে বিশিষ্ট শিল্পপতি মল্লিনাথ চৌধুরী যে অনুরাধার স্বামী সে সম্বন্ধে প্রায় হেলাফেলা করেই এক লাইনের একটা উল্লেখ আছে। অনুরাধার উজ্জ্বল, মহান, গৌরবময় জীবনে মল্লিনাথের আদৌ যে কোনো ভূমিকা আছে, এই লেখা পড়ে সেটা বোঝার উপায় নেই।

মল্লিনাথ দু দু'বার রিপোর্টটা পড়েন। প্রতিবেদকটি যা লিখেছে তার প্রতিটি বর্ণ নির্ভুল। একেবারে খুঁতহীন অবজেক্টিভ রিপোর্টিং। সত্যিই অনুরাধার এত সব বিপুল মহিমময় সোসাল ওয়ার্কের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক কি অন্য দিক থেকেই আছে? দু'জনের জীবন সেই ফুলশয্যার রাত থেকেই সমান্তরাল খাতে বয়ে চলেছে। মাঝখানের দূরত্ব ঘুচিয়ে দুই স্রোত যে কোনোদিন মিলতে পারবে, এমন সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রতিবেদকটি যা লিখেছে তার ভেতর থেকে অনুরাধার দেবীমহিমা ফুটে বেরিয়েছে। এই মহিমাকে ভীষণ ভয় পান মল্লিনাথ। আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করেন, সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাও। অনুরাধার দেবী ইমেজ তাঁর ওপর এমন এক চাপ তৈরি করে, মনে হয়, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

পড়া হয়ে গেলেও কাগজ থেকে চোখ সরান নি মল্লিনাথ। পলকহীন অনুরাধার ছবিটার দিকে তাকিয়েই আছেন। যাঁর স্ত্রী বিদেশে ভারতবর্ষের মর্যাদা বাড়িয়েছেন, যাঁর ভাবমূর্তি আরো দ্যুতিময় হয়েছে, যাঁর দেবীত্ব ধরাছোঁয়ার বাইরে বহুদূর উচ্চতায় পেঁৗছে গেছে, তাঁর স্বামী হয়ে তিনি এই যে এক শস্তা মেয়েমানুষকে নিয়ে চুপিসারে, ভয়ে ভয়ে, প্রায় চোরের মতো প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন সে জন্য কি গ্লানি বোধ করছেন মল্লিনাথ? কিন্তু না, এই ব্যাপারটা নিয়ে একেবারেই কিছু ভাবছেন না তিনি। আসলে সময়ের উলটো স্রোত তাঁকে একটানে আঠার কুড়ি বছর পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ইউনিভার্সিটিতে তখন মল্লিনাথের সিক্সথ ইয়ার চলছে। কয়েক মাস পরেই এম. এ'র ফাইনাল। তাঁর সাবজেক্ট ছিল অর্থনীতি।

তখন ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন অবনীমোহন মজুমদার। দুর্ধর্ষ পণ্ডিত। দেশে বিদেশে তাঁর প্রচণ্ড খ্যাতি। কলোনিয়ান ইণ্ডিয়ার গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর লেখা তাঁর তিন চারখানা বই তখন চারিদিকে হইচই ফেলে দিয়েছে। দেশের নানা ইউনিভার্সিটিতে তো বটেই, ইওরোপ আমেরিকার নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন কনফারেন্সে পেপার পড়া বা বক্তৃতা দেবার জন্য ফি মাসেই আমন্ত্রণ আসে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক কি কানাডার নানা পত্রপত্রিকা তাঁর লেখার জন্য অনবরত তাগাদা দেয়। নিজের লেখাপড়া, ইউনিভার্সিটির ক্লাস, সেমিনার, বক্তৃতা, ঘন ঘন বিদেশ যাত্রা, গবেষকদের গাইড করা, ইত্যাদি নিয়ে তাঁর ব্যস্ততার শেষ নেই। তাঁর প্রতিটি দিন অগুনতি কর্মসূচিতে ঠাসা।

সেদিন ইউনিভার্সিটিতে শেষ ক্লাসটা ছিল অবনীমোহনের।

ছুটির পর তাঁর পেছন পেছন ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে আসছিল। মল্লিনাথকে ডেকে তিনি বলেছিলেন, 'কাল সকালে তোমার ঘণ্টাখানেক সময় হবে?'

মল্লিনাথ জানতেন অবনীমোহন তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। শুধু স্নেহই না, তাঁর প্রতি ওঁর এক ধরনের দুর্বলতাই রয়েছে। মল্লিনাথের সামনা সামনি কখনও কিছু বলেন নি, তবে অন্যদের কাছে মন্তব্য করেছেন, তাঁর মতো ইকোনমিকসের দুর্দান্ত ছাত্র দশ পনের বছরের ভেতর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর দেখা যায় নি। এই সব মন্তব্যের টুকরো টাকরা মল্লিনাথের কানেও পৌঁছেছিল। অসীম ব্যগ্রতায় তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই হবে স্যার।'

'গুড। কাল আটটা নাগাদ আমাদের বাড়িতে চলে এসো। ঠিক আটটায় কিন্তু। আমার ঠিকানা হল—'

সময়ানুবর্তিতা ব্যাপারটা অবনীমোহনের কাছে অত্যন্ত জরুরী। সূর্যোদয় থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি দিনের রুটিন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। সময়ের সামান্য হেরফের ঘটলেও তিনি বিরক্ত হন। তাঁর কাছে এটা অমার্জনীয় অপরাধ।

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটাতেই অবনীমোহনের উত্তর কলকাতার বাড়িতে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। আগে আর কখনও তিনি এখানে আসেন নি। কেন অবনীমোহন তাঁকে বাড়িতে ডেকেছেন, ভেবে ভেবে অদ্ভুত টেনসানে ভাল করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেন নি।

অবনীমোহন তাঁর বিশাল লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়েছিলেন মল্লিনাথকে। মুখোমুখি বসে বলেছিলেন, 'বাড়িতে ডেকে আনার জন্যে খুব অবাক হয়ে গেছ বুঝতে পারছি কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না। তোমার সঙ্গে আমার কিছু দরকারী আলোচনা আছে। ইউনিভার্সিটিতে সেটা সম্ভব ছিল না। তাই—'

মল্লিনাথ উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কোনো উত্তর দেন নি।

অবনীমোহন এবার বলেছেন, 'কয়েক মাস বাদেই তোমার ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাবে। তারপর কী করবে ঠিক করেছ?'

মল্লিনাথ অনিশ্চিতভাবে বলেছেন, 'না, সেভাবে তেমন কিছু

ভাবিনি। তবে—'

'আই নো, আই নো—' আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন অবনীমোহন। আসলে বি. এ-তে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পরই মল্লিনাথকে ডেকে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর সম্বন্ধে নানা খবর নিয়েছিলেন তিনি। মল্লিনাথরা ক' ভাইবোন, বাড়িতে আর কে কে আছে, বাবা কী করেন, এইসব। তখন থেকেই তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি বোধ করতে শুরু করেছিলেন অবনীমোহন। তিনি থামেন নি, 'তোমাদের যা পারিবারিক অবস্থা তাতে তোমার কিছু একটা করা দরকার। অবশ্য আমার ইচ্ছে তোমার মতো একজন ব্রাইট স্টুডেন্ট রিসার্চ করুক—'

ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল মল্লিনাথের মুখে। বলেছিলেন, 'আমারও তাই ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না স্যর—'

অজস্র বইতে ঠাসা বিশাল লাইব্রেরিতে হঠাৎ যেন স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তারপর একসময় অবনীমোহন বলেছিলেন, 'খুবই দুঃখের ব্যাপার। আমিও তাই ভেবেছিলাম। সে যাক, নাউ লেট আস ফেস হার্ড রিয়ালিটি। তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি, মাস তিনেক বাদে আমি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

মল্লিনাথ চমকে উঠেছিলেন। অবনীমোহনের মতো একজন অধ্যাপক চলে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে কিন্তু তাঁর নিজস্ব যে ক্ষতিটা হবে তা অপূরণীয়। মুখ ফুটে তিনি অবনীমোহনের কাছে কখনও কিছু চান নি কিন্তু সবসময়ই মনে হয়েছে এই বড় মাপের হৃদয়বান মানুষটি তাঁকে সাহায্য করার জন্যই হাত বাড়িয়ে আছেন। মল্লিনাথ ঠিক করে রেখেছিলেন এম. এ-র রেজাল্টটা বেরিয়ে গেলে অবনীমোহনকে একটা চাকরির কথা বলবেন। তিনি জানতেন এই মানুষটির সঙ্গে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের যোগাযোগ আছে। নিজের বহু ছাত্রকে তিনি সে সব জায়গায় কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অন্তত কলেজের একটা লেকচারারশিপ জোগাড় করে দেওয়া তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই না। এ সবই সম্ভব এম. এ'র রেজাল্টটা বেরুবার পর। কিন্তু তার আগেই তো অবনীমোহন ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিচ্ছেন।

রুদ্ধশ্বাসে মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোথায় যাবেন স্যর ?'

অবনীমোহন বলেছেন, 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে। আপাতত পোস্টিংটা ম্যানিলায়, তারপর নিউইয়র্কে। যাবার আগে তোমার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে চাই। সেই জন্যে বাড়ীতে আসতে বলেছি।' একটু থেমে ফের শুরু করেছিলেন, 'এম. এ'র ডিগ্রিটা থাকলে খুব ভাল হ'ত কিন্তু তার জন্যে তো বেশ কয়েক মাস ওয়েট করতে হবে। যাই হোক, যেটা নেই তা নিয়ে মন খারাপ করার মানে হয় না। লুক মল্লিনাথ, আমি এর মধ্যে তোমার জন্যে চার পাঁচটা বড় কোম্পানিতে কথা বলেছি কিন্তু ওই সব জায়গায় তোমার উপযুক্ত পোস্টিং পেতে দেরি হবে। তবে—'

নিজের অজান্তেই যেন বলে ফেলেছিলেন মল্লিনাথ, 'তবে কী ?'

'আমার এক বন্ধুর কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে। বড় কিছু নয়, সব মিলিয়ে বছরে দু'কোটি টাকার টার্নওভার। বন্ধুটির স্বাস্থ্য একেবারে ভাল যাচ্ছে না, এরাটিক হেলথের জন্যে কোম্পানির এক্সপ্যানসান যে করবে, তা-ও পারছে না। তা ছাড়া নানা টাইপের ডিজঅনেস্ট লোক ওকে ঘিরে রয়েছে। টাকা পয়সা নিয়মিত চুরি হয়ে যাচ্ছে। প্রোডাকসান সমানে ফল করছে। ইনকাম ট্যাক্সের প্রচুর প্রবলেম। টোটাল ক্যাওস। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে একটা ভাল বাঙালি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান অবনীমোহন। অস্থির পায়ে ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় পায়চারি করতে থাকেন।

মল্লিনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, অবনীমোহনের কথা শেষ হয় নি। একটা বাঙালি প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা তাঁকে বেশ বিচলিত করেছে। মল্লিনাথ গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন।

যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই। অবনীমোহন পায়চারি থামিয়ে তাঁর চেয়ারটিতে বসে ফের শুরু করেন, 'প্রিয়তোষ, মানে ঐ কোম্পানির মালিক একজন বিশ্বাসী, ইনটেলিজেন্ট, সৎ এবং পরিশ্রমী লেফটেনান্ট চাইছে। কোম্পানিটাকে স্যালভেজ করার জন্যে একটা লাস্ট অ্যাটেম্পট সে নিতে চায়। আমি তোমার কথা প্রিয়তোষকে

বলেছি। ইটস আ ভেরি, ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব। ভেবে দেখ, এখানে কাজ করবে কিনা। মাইনে টাইনে ভালই দেবে। প্রিয়তোষ ইজ আ কনসিডারেট ফেলো উইদ আ ফাইন সিমপ্যাথেটিক মাইন্ড।'

মল্লিনাথ চুপ করে থাকেন।

অবনীমোহন থামেন নি, 'হয়ত ভাবছ, তোমার হাত-পা বেঁধে জীবনের শুরুতেই তোমাকে আগুনের ভেতর ছুঁড়ে দিচ্ছি। কিন্তু এটাই তো চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করার বয়স। একটা ব্যাপারে তোমাকে অ্যাসিওর করতে পারি, প্রিয়তোষের কারখানার ওয়ার্কারিরা বেশ ভাল, এফিসিয়েন্ট। ইউনিয়নও রিজনেবল।'

মল্লিনাথ এতক্ষণ শুনেই গেছেন। এবার বলেন, 'তা হলে প্রোডাকসান ফল করছে কেন?'

'এদের ঠিকমতো কাজে লাগাতে হবে তো। মাসের মধ্যে পনের দিন র' মোটিরিয্যাল সাপ্লাই থাকে না। ওয়ার্কারেরা কী করবে? তাস খেলে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দেয়। তা ছাড়া ধর, ইলেকট্রিসিটির একটা বড় রকমের প্রবলেম রয়েছে আমাদের স্টেটে। সেই অনুযায়ী ডিউটি আওয়ার্স ফিক্স করা উচিত। কিন্তু কিছুই করা হয়নি।'

'কেন?'

'যাদের ওপর দায়িত্ব তারাই গোলমালটা করছে।'

'এতে তাদের লাভ?'

'ডিটেলে বলতে পারব না। প্রিয়তোষ সব জানাবে। তুমি কি কাজটা নিতে রাজী আছ?

মল্লিলাথ বলেছেন, 'কিন্তু স্যর, সামনেই আমার পরীক্ষা।'

অবনীমোহন গলার স্বর সামান্য তুলে বলেছেন, 'কী আশ্চর্য, আমি তোমাকে আজই জয়েন করতে বলছি নাকি? আগে পরীক্ষা, তারপর কাজ। আমি ম্যানিলায় চলে যাব তো। তুমি রাজী হলে, যাবার আগেই প্রিয়তোষের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে যাওয়া দরকার।'

ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছেন মল্লিনাথ। বলেছিলেন, 'আমি রাজী আছি স্যর।' তাঁর মনোভাবটা ছিল এই রকম। চাকরির বাজার যেমন অনিশ্চিত তাতে অবনীমোহন দেশে থাকতে থাকতে একটা কাজ ঠিক করে রাখা দরকার। পরীক্ষার পর

ভাল কিছু পেলে ওটা ছেড়ে দিতে কতক্ষণ !

প্রায় থট-রীডারের মতো অবনীমোহন এবার বলেছিলেন, 'আমার বিদেশের ঠিকানা দিয়ে যাব। কনট্যাক্ট রেখো। যদি প্রিয়তোষের ওখানে কিছু করা সম্ভব না হয়, ফরেনে তোমার ব্যবস্থা করে দিতে পারব, আশা করি।'

কৃতজ্ঞ চোখে অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মল্লিনাথ।

অবনীমোহন বলেছেন, 'তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এটা নিয়ে সুবিধেমতো প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখা ক'রো। আজকালের ভেতর ফোন করে তোমার কথা ওকে জানিযে দেবো।'

'আচ্ছা স্যর।'

অবনীমোহনেব চিঠি নিয়ে দিন পনের বাদে প্রিযতোষ মল্লিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করেছিলেন মল্লিনাথ।

ষাটের কাছাকাছি বয়স ভদ্রলোকের। দেখা মাত্র টেব পাওযা যায় বেশ অসুস্থ। অবনীমোহনেব চিঠিটা এক পলক দেখে নিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার সম্বন্ধে অবনী ডিটেল আমাকে সব বলেছে। ভেরি হ্যাপি টু মীট ইউ।'

মল্লিনাথ বলেছিলেন, 'আপনার কথাও স্যর আমাকে অনেক বলেছেন। আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উনি খুবই চিন্তিত। স্যর চান, এটা ভালভাবে বেঁচে থাক।'

প্রিয়তোষ বিষণ্ন হেসে বলেছিলেন, 'এর অনেক ডিজিজ। অনেকটা আমার মতোই। সে সব সারানো খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার। তা ছাড়া ভালভাবে বাঁচতে হলে তার গ্রোথও দবকার। সে যাই হোক, কোম্পানিব প্রবলেম নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে। অবনী আমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছে, পরীক্ষার আগে আমার চিন্তা যেন তোমার মাথায় ঢুকিয়ে না দিই।' একটু থেমে ফের বলেছেন, 'অবনী রেকমেণ্ড করেছে। দ্যাটস দা লাস্ট ওয়ার্ড। তবু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমার পাশে থাকলে কোম্পানিটাকে বেশ বড় করে তুলতে পারব।'

একটু হেসে মল্লিনাথ বলেছেন, 'স্যব আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁর সার্টিফিকেট হয়ত আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে।'

'একেবারেই না। অপাত্রে স্নেহ বর্ষণ করার মতো মানুষ অবনী

নয়। তা ছাড়া লোক চেনার একটা ইনস্টিংক্ট আমার আছে। সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে, তোমার মতো একজনকে আমার ভীষণ দরকার।'

এরপর সামান্য দু-চারটে কথা হয়েছিল। সেগুলো মল্লিনাথের পড়াশোনা এবং প্রিয়তোষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে। তখনই জানা গিয়েছিল, একটা ম্যাসিভ স্ট্রোক হবার পর প্রিয়তোষের বুকে পেস-মেকার বসানো হয়েছে। বেশি টেনসান, দুশ্চিন্তা এবং অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ।

সেদিন বিদায় নেবার সময় মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'পরীক্ষার আগে একেবারেই না। তবে ইচ্ছে হলে মাঝে মধ্যে ফোন করতে পারো।'

মনে আছে, এম. এ পরীক্ষা যেদিন শেষ হল তার পরদিনই প্রিয়তোষের অফিসে চলে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। ফোনে যোগাযোগ রাখলেও ক'মাস পর প্রিয়তোষকে আবার সামনাসামনি দেখলেন। এর মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়েছে, বয়সটা আচমকা কয়েক বছর বেড়ে গেছে যেন। চোখেমুখে ক্লান্তি এবং দুর্ভাবনার ছাপ।

মল্লিনাথকে দেখে প্রিয়তোষের রুগ্ণ অসুস্থ চেহারায় সামান্য সজীবতা ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, 'পরীক্ষা কাল শেষ হল, তাই না?'

বোঝা যায়, প্রিয়তোষ এই তারিখটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

মল্লিনাথ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কেমন হল?'

'ভাল। ফার্স্ট-ক্লাস নিশ্চয়ই পাব।'

এমনিতে পরীক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে, 'মোটা-মুটি দিয়েছি।' মল্লিনাথের উত্তর প্রিয়তোষকে খুশি করেছিল। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস না থাকলে এমন জোর দিয়ে রেজাল্টের কথা বলা যায় না। তিনি বলেছিলেন, 'ভেরি গুড। হাতে খানিকটা সময় নিয়ে এসেছ তো?'

মল্লিনাথ মাথা হেলিয়ে বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজই তোমার সঙ্গে কোম্পানির বিষয়ে কথা বলে নিতে চাই।'

মল্লিনাথ জানিয়েছিলেন, পরীক্ষার পর তাঁর হাতে এখন অঢেল

সময়। প্রিয়তোষ যতক্ষণ বলবেন তিনি থেকে যাবেন।

'ফাইন।' প্রিয়তোষ বলেছেন, 'এখানে নয়, আমাদের বাড়ি চল। ওখানে বসেই ডিসকাসান হবে। একেবারে ডিনার সেরে তার পর ছাড়া পাবে।'

বোঝা যাচ্ছিল, প্রিয়তোষ আর দেরি করতে চান না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মল্লিনাথের হাতে কোম্পানির বড় দায়িত্ব দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে চান।

বিকেলের দিকে প্রিয়তোষের অফিসে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। আর সন্ধের আগেই তাঁকে সঙ্গে করে নিজেদের নিউ আলিপুরের বিশাল কমপাউণ্ডওলা বাংলোয় চলে গিয়েছিলেন প্রিয়তোষ।

সামনের দিকে একধারে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের 'লন', আরেক দিকে ফুল এবং দুষ্প্রাপ্য ক্যাকটাসের বাগান। মাঝখান দিয়ে নুড়ির সুদৃশ্য পথের দুধারে সযত্নে তৈরি-করা ছাতার আকারের একই মাপের ঝাউয়ের সারি। পেছন দিকে গ্যারাজে ঝকঝকে মারুতি, অ্যাম্বাসাডর আর ফরেন ফিয়েট মিলিয়ে চার পাঁচটা গাড়ি। এ ছাড়া বয়, বেয়ারা, মালী, নেপালী দারোয়ান ইত্যাদি। প্রিয়তোষরা আর্থিক দিক থেকে কোন স্তরের মানুষ সেটা বাংলোতে পা দিলেই টের পাওয়া যায়।

চমৎকার সাজানো বিশাল ড্রইং রুমে নিয়ে গিয়ে মল্লিনাথকে বসিয়েছিলেন প্রিয়তোষ। একটা বেয়ারাকে ডেকে অ্যাটাচড বাথরুমে তোয়ালে টোয়ালে দিতে বলে মল্লিনাথের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'একটু রেস্ট নিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি পোশাকটা চেঞ্জ করে আসছি।'

ড্রইং রুমের মাঝখান দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। প্রিয়তোষ সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে ওপরে চলে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসেছেন প্রিয়তোষ। তাঁর পরনে এবার ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি। ততক্ষণে মল্লিনাথ টয়লেট থেকে হাতে-মুখে জল দিয়ে এসেছেন। প্রিয়তোষের পেছন পেছন একটা বয় ট্রে-তে প্লেটে করে অনেকগুলো দামী দামী খাবার এবং চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে একধারে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রিয়তোষ হাতের ইশারায় বেয়ারাটাকে চলে যেতে বলে মল্লিনাথকে বলেন, 'নাও, শুরু কর। খেতে খেতে কথা হবে। আগেই জানিয়ে দিচ্ছি আমার ডায়েট ভীষণ রেস্ট্রিকটেড। এসব খাবার আমার কোনোটাই চলবে না। আমি শুধু চিনি-ছাড়া এক কাপ চা খাব।

অগত্যা কুণ্ঠিতভাবে একটা ফাঁকা প্লেটে সামান্য কিছু খাবার তুলে নিয়ে মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে খেতে শুরু করেছিলেন মল্লিনাথ। যদিও প্রিয়তোষের সস্নেহ ব্যবহার এবং উদারতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কখনও প্রিয়তোষ বুঝতে দেন নি, সামাজিক এবং আর্থিক দিক থেকে তাঁদের মধ্যে কতটা পার্থক্য, তবু হঠাৎ এরকম একটা পরিবেশে এসে পড়ায় এক ধরনের আড়ষ্টতা বোধ করে-ছিলেন তিনি। এর আগে এত বড়লোকের বাড়িতে ঢোকার সুযোগ হয় নি তাঁর।

প্রিয়তোষ মুখোমুখি বসে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। মল্লিনাথের মতো মানুষদের (তখন তিনি সোসাইটির যে স্তরে ছিলেন) মনস্তত্ত্বটা তিনি বুঝতে পারতেন। তাঁর আড়ষ্টতার কারণ আন্দাজ করে প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'সঙ্কোচ করো না। বী ফ্রী অ্যাণ্ড রিল্যাক্সিং।'

নিজেকে স্বাভাবিক করে নিতে অবশ্য বেশিক্ষণ সময় লাগে নি মল্লিনাথের।

এরপর আসল কথায় চলে গিয়েছিলেন প্রিয়তোষ। তাঁর কোম্পানি 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস' যে দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার কারণগুলো একে একে জানিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য অবনীমোহনের মুখে আগেই কিছু কিছু শুনেছিলেন মল্লিনাথ।

শতকরা নব্বই ভাগ ত্রুটিই হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের। প্রিয়তোষের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে কোরাপসান অর্থাৎ দুর্নীতিতে সব ছেয়ে গেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ইনকাম ট্যাক্স, প্রোফেশন্যাল ট্যাক্স, এমপ্লয়ীদের এল. আই. সি প্রিমিয়াম, ই. এস. আই-এর টাকা অনেক-দিন জমা দেওয়া হয় নি। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসন, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড প্রচুর টাকা পাবে। এসব নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল চলছে। কর্মচারীদের মাইনে ঠিকমতো দেওয়া যাচ্ছে

না। এক মাসের স্যালারি দশ তারিখে দেওয়া হলে পরের মাসেরটা দিতে দিতে হয়ত তিরিশ তারিখ হয়ে যায়।

এম. এ পরীক্ষার আগে মল্লিনাথ যখন প্রথম প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখা করেন তখনও সাধারণ এমপ্লয়ীরা আশা করেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দিন দিন অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। আর প্রতিদিনই অফিসে এবং কারখানায় মিটিং আর স্লোগান চলছে। সব মিলিয়ে অগ্নিগর্ভ উত্তেজক অবস্থা। যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ওয়ার্ক কালচারটা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস' মোট চার রকমের প্রোডাক্ট তৈরি করে। এক, রেলের ইঞ্জিনের জন্য ছোট ছোট যন্ত্রপাতি। দুই, টেলিভিসনের পার্টস। তিন, নানারকম কসমেটিকস। চার, দামী সুতোর গেঞ্জি, প্যান্ট, মোজা, জাঙিয়া ইত্যাদি। এই সব প্রোডাক্টের দারুণ সুনাম আর চাহিদা। এর জন্য কলকাতার দশ কিলো-মিটারের মধ্যে চারটি কারখানা রয়েছে প্রিয়তোষের।

কিন্তু কোম্পানির সুনাম কিছুদিন ধরে প্রায় নষ্টই হয়ে গেছে। প্রথমত, ডিমাণ্ড এবং অর্ডার অনুযায়ী মাল সাপ্লাই দেওয়া যাচ্ছে না। তার বড় কারণ ফিনিশড প্রোডাক্টের জন্য যে র' মেটিরিয়াল অর্থাৎ কাঁচা মালের দরকার তার ঠিকমতো যোগান দেওয়া যাচ্ছে না কারখানাগুলোতে। দ্বিতীয়ত, বহুবার বলার পর তৃতীয় শ্রেণীর রদ্দি কাঁচা মাল দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বলতে আর কিছু নেই। খুবই দুর্নাম হয়ে গেছে 'জেনিথ এন্টার-প্রাইজেস'-এর। পুরনো ক্লায়েন্টদের মধ্যে প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের। তারা বার বার সতর্ক করে দিয়েছে প্রিয়তোষকে। অনেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ অর্ডার দিয়ে ক্যানসেল করেছে। কেউ কেউ মাল ডেলিভারি নেবার পর সব ফেরত পাঠিয়েছে।

কোম্পানির আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে এখন আকাশ পাতাল ফারাক। ব্যাঙ্ক থেকে প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য যে 'লোন' দেওয়া হয়েছিল দু'বছর তার একটা ইনস্টলমেন্টও শোধ করা হয় নি। সুদ বেড়ে বেড়ে অঙ্কটা এক বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে।

এই মুহূর্তে প্রিয়তোষের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া, নইলে কঠোর হাতে সেটাকে চালিয়ে ফের লাভজনক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

যে কোনো মুহূর্তে 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে চার শ' মানুষ বেকার হয়ে যাবে। চার শ' এমপ্লয়ী মানে চার শ' ফ্যামিলি। এখন চাকরির যা বাজার তাতে এতগুলো মানুষকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে মন চায় না। কিন্তু শক্ত হাতে প্রিয়তোষ কোম্পানি যে চালাবেন তার উপায়ও নেই। বুকে যাঁর পেসমেকার বসানো তাঁর পক্ষে কতটা চাপ নেওয়া সম্ভব? কতটা পরিশ্রম করতে পারেন তিনি? ডাক্তাররা বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, যে কোনো রকম উত্তেজনা তাঁর পক্ষে মারাত্মক।

প্রিয়তোষ বলেছেন, 'আমি জানি ম্যানেজমেণ্টের কোন কোন লোক কিভাবে কোম্পানির ক্ষতি করছে। এদের শায়েস্তা করতে পারলে, মানে এদের বিরুদ্ধে কড়া ডিসিপ্লিনারি স্টেপ নিতে পারলে প্রবলেম এইটি পারসেন্ট কমে যাবে।'

খাওয়া থামিয়ে পলকহীন প্রিয়তোষের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মল্লিনাথ। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে তাঁর কথাগুলো শুনছিলেন। বলেন, 'কড়া স্টেপ নেবার অসুবিধাটা কোথায়?'

'আমার স্বাস্থ্য। এমনিতেই চূড়ান্ত গোলমাল চলছে। তার ওপর যদি বদমাশদের গায়ে হাত পড়ে আমাকে আরেকটা ফ্রন্টে লড়াই শুরু করতে হবে। সে টেনসান সহ্য করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। যদিও কিছুদিন বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা আর থাকবে না।'

একটু ভেবে মল্লিনাথ এবার বলেছেন, 'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী?' উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করেছেন প্রিয়তোষ।

মল্লিনাথ বলেছেন, 'কোম্পানির ক্ষতি করে এদের কী স্বার্থ?'

'আমার ধারণা, এরা 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'কে স্যাবোটেজ করছে।'

'কিরকম?'

প্রিয়তোষ এবার ব্যাপারটা এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা যা যা প্রোডাক্ট তৈরি করেন, আরো অনেক ফার্ম তা-ই করে থাকে। কিন্তু তুলনায় তাঁদের প্রোডাক্ট অনেক ভাল বলে অন্যেরা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। যে পদ্ধতিতেই হোক না, তারা 'জেনিথ এণ্টারপ্রাইজেস'-এর ক্ষতি করতে চায়। এই কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলে শত্রুপক্ষের যথেষ্ট লাভবান হবার কারণ আছে। প্রিয়তোষের দৃঢ় বিশ্বাস, তারাই তাঁর লোকজনকে প্রচুর পয়সা খাইয়ে এভাবে সর্বনাশ করে চলেছে।

মল্লিনাথের মনে হয়েছিল, প্রিয়তোষ যা বলেছেন তা অসম্ভব নাও হতে পারে। বরং এটাই বিশ্বাসযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'এ ব্যাপারটা আপনি ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নকে জানান নি কেন?'

'জানাই নি, তার কারণ বেশ কয়েকটা। প্রথমত, মালিকদের সম্পর্কে শ্রমিকদের একটা পার্মানেন্ট ধারণাই রয়েছে যে তারা এক্সপ্লয়টার। যারা সাবোটেজ করছে তারা এখানকার এমপ্লয়ী। ওদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে ইউনিয়ন ভাববে, কর্মচারীদের মধ্যে আমি ডিভিসন করতে চাইনি। দ্বিতীয়ত, যারা ক্ষতি করছে তারা এত চতুর যে চট করে কারো পক্ষে তাদের ধরা মুশকিল। তৃতীয়ত, ওয়ার্কাররা কনভিন্সড হয়ে খেপে উঠলে রক্তপাত ঘটে যেতে পারে, সেটা আমি চাই না। তাই মুখ বুজে থাকতে হয়েছে।'

একটু ভেবে মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনি আমাকে দিয়ে আপনার কোম্পানির কী কাজ করাতে চান?'

প্রিয়তোষ বলেছেন, 'যে ডিপার্টমেন্টগুলো থেকে ট্রাবল তৈরি হচ্ছে সেগুলো তোমাকে ঠিক করতে হবে।'

'আমি একেবারে নতুন, এক্সপিরিয়েন্স নেই। আমার একার পক্ষে এসব করা কি সম্ভব?'

'তুমি একা থাকবে কেন, আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমাকে রাইট ডিরেকসানে গাইড করব। মাত্র কয়েকটা লোক মল্লিনাথ, ওনলি ফাইভ অর সিক্স, এদের টিট করতে পারলে কোম্পানিটা বেঁচে যায়।'

মল্লিনাথের বেশ খটকা লেগেছিল। তিনি কি কোনো ষড়যন্ত্রের

মধ্যে গিয়ে পড়বেন ? বাংলাদেশে হাজার হাজার বুদ্ধিমান শিক্ষিত যুবক থাকতে তাঁর জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছেন কেন প্রিয়তোষ ? তাঁরা গরীব. লোভ দেখিয়ে তাঁকে নিজের ইচ্ছামতো কাজে লাগানো যাবে—এই জন্যই কি ? পরক্ষণেই অবনীমোহনের কথা তাঁর মনে পড়েছে। আর যাই হোক, তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে, ঐ মানুষটি কখনো তা ভাবতেই পারেন না, জেনেশুনে তিনি নিশ্চয়ই বিপদের মুখে তাঁকে ঠেলে দেন নি। তাঁর মতো একটি অসহায় দরিদ্র পরিবারের ছেলের জীবন নষ্ট করে অবনীমোহনের লাভই বা কী ? তাছাড়া প্রিয়তোষের মুখচোখ দেখে মনে হয় না তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র অভিসন্ধি আছে। বরং তিনি আন্তরিকভাবেই তাঁর সাহায্য চান।

প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'আমার শরীর ভাল থাকলে নিজেই যা করার করতাম। কিন্তু অনেস্ট এবং সাহসী কারো হেল্প ছাড়া আমার পক্ষে একটা পা-ও ফেলা সম্ভব না।' একটু থেমে ফের বলেছেন, 'একটা ব্যাপারে তোমাকে ভরসা দিতে পারি, আমাদের ওয়ার্ক ফোর্স মানে এমপ্লয়ীরা যদি বুঝতে পারে তাদের জন্যে তুমি কিছু করছ ওদের সবার সাহায্য তুমি পাবে। তখন তোমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

মল্লিনাথ বলেছিলেন, 'আমি বাইরে থেকে যাচ্ছি। ওয়ার্কাররা আমাকে তাদের ওয়েল-উইশার মনে করবে কেন ?'

প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'ওদের আস্থা যাতে পাও, সেই চেষ্টা তোমাকে করতে হবে। সেটা যদি করতে পার, এইট্টি পারসেন্ট কাজ হয়ে গেল।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে বাইরের লন-এর দিক থেকে কোনো গাড়ি থামার আওয়াজ ভেসে আসে। একটু পর দেখা যায়, একজন মধ্যবয়সী মহিলা এবং একটি তরুণী ড্রইংরুমে এসে ঢোকেন। দু'জনেই দুর্দান্ত সুন্দরী, বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাটি। এই বয়সে সৌন্দর্য তো অস্তগামী হবার কথা কিন্তু কোনো অলৌকিক ম্যাজিকে তিনি সেটাকে যেন চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। আর এই সৌন্দর্যের দ্যুতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর চমৎকার পোশাক, তাঁর হীরের নাকছাবি, হীরের

আংটি, হীরের লকেটওলা হার, ডান হাতে কারুকাজ-করা সোনার কঙ্কণ, বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডে ছোট্ট ওভাল শেপের বিদেশী ঘড়ি এবং সোনালি জরি দিয়ে কাজ-করা পায়ের স্লিপার। কিন্তু এ সব ছাড়াও আরো কিছু ছিল। সেটা তাঁর উগ্র আভিজাত্য। তাঁর তাকানো, চলার ভঙ্গি—সমস্ত কিছুর মধ্যেই গোটা পৃথিবীকে তাচ্ছিল্য করার ভাব।

মহিলাকে দেখামাত্র নিজের অজান্তে ভেতরে ভেতরে বেশ কুঁকড়ে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। কোনো কারণ নেই, তবু কেন যেন এক ধরনের অস্বস্তিই বোধ করতে শুরু করেছিলেন। মনে হচ্ছিল, তাঁর এবং মহিলাটির মধ্যে এমন এক দূরত্ব রয়েছে যা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছুনো অসম্ভব। মল্লিনাথের স্নায়ুমণ্ডলী চকিতে টান টান হয়ে গিয়েছিল।

তরুণীটির চেহারার সঙ্গে মহিলার দারুণ মিল। নাক-মুখের ছাঁদ প্রায় একই রকম। ঠোঁট, কপাল আর চিবুকের গড়ন অবশ্য সামান্য আলাদা। দেখেই বোঝা যায়, হয় তাঁরা মা এবং মেয়ে, নইলে দুই বোন।

এটা মানতেই হবে তরুণীটির মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ থাকলেও মধ্যবয়সিনীর মতো অতটা উগ্র নয়। পৃথিবীকে সে হয়ত করুণার দৃষ্টিতেই দেখে থাকে, তবে ঐ মহিলার মতো অমন চোখে আঙুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দেয় না।

মহিলা তরুণীটিকে নিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে প্রিয়তোষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অফিস থেকে কখন ফিরলে ?'

প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'মিনিট কুড়ি আগে। এই ছেলেটিই মল্লিনাথ। আমার অফিসে এসেছিল, বাড়িতে ধরে নিয়ে এলাম। এর কথা তোমাকে আগে বলেছিলাম—মনে আছে নিশ্চয়ই ? ভেরি ব্রাইট ইয়ং ম্যান।'

মহিলা দাঁড়ান নি। চলতে চলতে বলেছিলেন, 'ও—' শুধু চেহারায়, তাকানোয় বা হাঁটার ভঙ্গিতেই নয়—কণ্ঠস্বরেও সেই কৌতূহলহীন তাচ্ছিল্য।

প্রিয়তোষ এবার মহিলা এবং তরুণীর পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রী চন্দ্রাবতী আর মেয়ে অনুরাধা।'

মনে মনে এইরকমই একটা অনুমান করেছিলেন মল্লিনাথ। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আধফোটা গলায় বলেছেন, 'নমস্কার—'

অনুরাধা এবং চন্দ্রাবতী ততক্ষণে সিঁড়ির কাছে চলে গেছেন। মল্লিনাথের সঙ্গে আলাপ করার জন্য তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। প্রতি-নমস্কারও তাঁরা জানান নি, মল্লিনাথের উদ্দেশে নিতান্ত অবহেলায় সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছিলেন।

গলার স্বর সামান্য তুলে প্রিয়তোষ এবার স্ত্রীকে বলেছেন, 'মল্লিনাথ রাত্তিরে এখানে ডিনার খেয়ে যাবে।'

নিস্পৃহ সুরে চন্দ্রাবতী বলেছেন, 'আচ্ছা—' বলে আর ফিরেও তাকান নি মল্লিনাথের দিকে।

দুই মহিলা দোতলায় অদৃশ্য হবার পর প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'কী হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো, বসো—'

বেশ ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন মল্লিনাথ। গরীব হলেও আত্মসম্মানে খুব আঘাত লেগেছিল। ওঁরা যথেষ্টই অর্থবান আর অভিজাত, তাই বলে সৌজন্য এবং ভদ্রতার খাতিরে সামান্য দু-একটি কথাও কি বলতে পারতেন না? অথচ এই প্রিয়তোষ মল্লিক মানুষটি চমৎকার। অমায়িক, ভদ্র, সহৃদয়। তাঁর আচরণে বা কথাবার্তায় কোনোরকম দম্ভ বা অহমিকার লেশমাত্র নেই। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে স্বভাবের দিক থেকে একেবারেই বিপরীত মেরুর। বসতে বসতে মল্লিনাথ বলেছেন, 'স্যর, আজ ডিনার থাক। আমার অন্য একটা কাজ আছে। বাড়ি ফিরতে হবে।'

তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন প্রিয়তোষ। বলেছিলেন, 'জীবনের সবে তো শুরু। অনেক কিছু ফেস করতে হবে। তার খুব সামান্য অংশই মনে রাখতে হয়, বাকিটা সম্পর্কে টোটালি ইনডিফারেন্ট থাকা ভাল। নইলে নিজের কাজ করা যায় না।' একটু থেমে ফের বলেছিলেন, 'সেন্টিমেন্ট ব্যাপারটা অপ্রয়োজনীয়, সে কথা বলি না। তবে মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব ভুলে থাকলে উপকৃত হবে।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন মল্লিনাথ কিন্তু কোনো উত্তর দেন

নি। মুখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রিয়তোষ থামেন নি, স্থির চোখে মল্লিনাথকে লক্ষ করতে করতে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করেছেন, 'তোমার বাড়িতে যে কাজটার কথা বললে, সেটা নিশ্চয়ই আগে ঠিক করা ছিল না, এই মাত্র মনে মনে বানিয়ে নিয়েছ—তাই তো?'

ভদ্রলোক কি মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারেন? এভাবে ধরা পড়ে যাবেন, ভাবতে পারেন নি মল্লিনাথ। ভেতরে ভেতরে তিনি ভীষণ হকচকিয়ে গেছেন। চোখ তুলে প্রিয়তোষের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারেন নি।

প্রিয়তোষ এবার বলেছেন, 'আমার সঙ্গে তোমার যে কাজটা রয়েছে সেটা খুবই জরুরি—ভেরি, ভেরি আর্জেন্ট। 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এ তোমায় জয়েন করার আগে আজ ডিটেলে সমস্ত রকম ডিসকাসান শেষ করে ফেলতে চাই। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে আর নেই। প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট ধরে আমরা আলোচনা করব। তোমার জন্যে আমি একটা লিস্ট করে রেখেছি। সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে কোথায় কোন ভিলেনটি গোলমাল পাকাচ্ছে। তুমি একেবারেই নতুন। ওদের কাজের পদ্ধতি জানা থাকলে কাউন্টার করতে তোমার পক্ষে সুবিধে হবে।'

মল্লিনাথের ক্ষোভ কাটে নি, কিন্তু প্রিয়তোষের মধুর সস্নেহ ব্যবহারের মধ্যেও এমন এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে তাঁর মুখের ওপর সরাসরি বলা যায় নি, 'আমার পক্ষে এ বাড়িতে ডিনার খাওয়া সম্ভব না।' তা ছাড়া প্রিয়তোষের কোম্পানির কাজটা তাঁর ভীষণ দরকার। তাঁর এম. এ পরীক্ষার ঠিক আগে সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ বাবা মারা গেছেন, ছোট ভাইটা কলেজে পড়ছে, মা সারা বছরই একটা না একটা অসুখে ভোগেন। একমাত্র বাঁচোয়া, দুই বোনের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। যেটুকু সঞ্চয় ছিল, বোনেদের বিয়েতে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটা কাজ না জুটলে উপোস একেবারে অবধারিত। সেন্টিমেন্ট নিয়ে বসে থাকলে কিছুটা আত্মপ্রসাদ হয়ত হয় কিন্তু পেট ভরে না। পয়সা রোজগারটা তখন সবচেয়ে জরুরি।

অবনীমোহন দেশে থাকলেও তাঁকে অন্য কোথাও কাজ জোগাড় করে দেবার কথা বলা যেত। ওঁর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ অবশ্য ছিল, তিনি তখন নিউ ইয়র্কে। তাঁকে একটা চিঠি অবশ্য লেখা যায়। কিন্তু প্রিয়তোষের ফার্মে যে কাজের ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন. সামান্য মান-সম্মানের কারণে সেটা না নিয়ে চিঠি লিখে বসাটা ঠিক হবে কিনা, সে সম্বন্ধে হঠাৎ তাঁর মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল। অপমান বোধের তীব্রতা একটু কমে এলে মল্লিনাথ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছিলেন, তাঁর কাজ প্রিয়তোষের সঙ্গে। চন্দ্রাবতী এবং অনুরাধার সঙ্গে তাঁর কিসের সম্পর্ক? এ বাড়িতে তাঁর আসার বিশেষ প্রয়োজন নেই, যদি কোনো কারণে আসতেই হয় ওঁদের এড়িয়েই চলবেন মল্লিনাথ।

মনে আছে, সেদিন ডিনারের আগে পর্যন্ত 'জেনিথ এন্টার-প্রাইজেস'-এর প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সমস্ত রকম আলোচনা করেছিলেন তাঁরা। প্রিয়তোষ একটা বড় ব্রাউন রঙের খামে প্রচুর টাইপ-করা কাগজপত্র দিয়ে বলেছিলেন, 'বাড়িতে নিয়ে এগুলো পড়ে দেখো। এর ভেতর কোম্পানির হিস্ট্রি থেকে শুরু করে এখনকার সমস্যার সব কিছু ডিটেলে রয়েছে। তা ছাড়া যদি 'রট' কাটিয়ে উঠতে পারি ফিউচার গ্রোথের জন্যে একটা ব্লু-প্রিন্টও করে রেখেছি। সেটা ভাল করে দেখো। অবশ্য তুমি যদি নতুন আর বেটার কিছু ভাবতে পারো, সেই মতোই কাজ হবে।'

দোতলায় চমৎকার সাজানো বিশাল ডাইনিং হল। কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় সেখানে প্রিয়তোষের সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ।

ডাইনিং হল্-এর সঙ্গে মানিয়ে মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড খাওয়ার টেবল। তার ওপর কারুকাজ-করা দামী চাদর পাতা। টেবলটাকে ঘিরে প্রায় তিরিশটা গদিমোড়া আরামদায়ক চেয়ার সাজানো ছিল। মাথার ওপর বিরাট ঝাড়লণ্ঠনে নানা রঙের আলো জ্বলছিল। একটা দেয়ালের গোটাটা জুড়ে অ্যাকুয়েরিয়াম। তার ভেতর রঙিন মাছেরা খেলে বেড়াচ্ছিল। অন্য দেয়ালগুলোর গায়ে নানা ধরনের সুদৃশ্য কাবিনেটে দামী দামী ক্রকারি, কাঁটা, চামচ ইত্যাদি। একটা

রবারের চাকা-লাগানো স্ট্যাণ্ডের ওপর কালার টিভি। এক কোণে পাশাপাশি তিনটে সবুজ রঙের বেসিন। সিলিং থেকে গোটা দুয়েক ঝকঝকে ফ্যান ঝুলছিল। আবার সেই সঙ্গে দুই দেয়ালে ফোকর বানিয়ে এয়ার কুলারও বসানো ছিল।

ডাইনিং হল-এর বাঁ দিকে সরু প্যাসেজ। তার ওধারে কিচেন। সেখানে রান্নার লোক এবং দু-তিনটে বেয়ারাকে দেখা যাচ্ছে।

মল্লিনাথরা দু'জন ছাড়া ডাইনিং হল-এ আর কেউ ছিল না। প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'ব'সো—'

ওঁরা বসতে না বসতেই চন্দ্রাবতী এবং অনুরাধাও এসে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং হল-এর আবহাওয়া পালটে গিয়েছিল। বেয়ারা টেয়ারা থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজের লোক তটস্থ হয়ে উঠেছিল। মল্লিনাথ টের পাচ্ছিলেন, প্রিয়তোষের সামনে এ বাড়ির কাজের লোকেরা অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কিন্তু চন্দ্রাবতী আর অনুরাধাকে দেখামাত্র তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

যান্ত্রিক নিয়মে দু'টি বেয়ারা কাচ আর সেরামিকের নানারকম পাত্রে অজস্র রকমের সুখাদ্য নিয়ে এসে টেবলে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

আগেই সাদা ধবধবে ন্যাপকিন কুঁচিয়ে জাপানি পাখার আকারে কাচের গেলাসে রাখা ছিল। সেই সঙ্গে বিভিন্ন শেপের চামচ, ফর্ক, সাইড ডিশ ইত্যাদি।

এভাবে, এমন পরিবেশে এত সুন্দরী অনাত্মীয় মহিলাদের সঙ্গে টেবলে বসে খাওয়ার অভ্যাস ছিল না মল্লিনাথের। তা ছাড়া এত ভাল ভাল খাবার, কোনটা আগে কোনটা পরে খেতে হয়, তিনি জানতেন না। খাওয়া তো দূরে থাক, বেশির ভাগের নামও তখন তাঁর অজানা। এর আগে চামচ ফর্ক দিয়ে কখনও খান নি। খুবই বিপন্ন হয়ে পয়েছিলেন মল্লিনাথ।

তাঁর অসুবিধা এবং অস্বস্তির কারণটা বুঝতে পেরেছিলেন প্রিয়তোষ। বলেছেন, 'তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। খাওয়াটা নিজের নিজের মতো করে খেতে না পারলে তৃপ্তি হয় না। তুমি

হাত দিয়েই খাও।' বলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারা দু'টিকে খাবার সার্ভ করতে বলেছিলেন।

এক সময় ডিনার শুরু হয়েছিল। সবাই কোলে ন্যাপকিন পেতে ফর্ক এবং চামচ দিয়ে খাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন মল্লিনাথ। যাঁর সম্পর্ক শুধু প্রিয়তোষ আর 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর সঙ্গে, অন্যদের গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই তাঁর। চামচ এবং ফর্ক টর্কের তোয়াক্কা না করে তিনি হাত দিয়েই খেতে শুরু করেছিলেন।

খেতে খেতে মল্লিনাথ টের পাচ্ছিলেন ডাইনিং হল-এর দুই সুন্দরী অভিজাত মহিলা মাঝে মাঝে চোখ কুঁচকে তাঁকে লক্ষ করছেন। একটা গেঁয়ো, আধা-সভ্য টাইপের যুবকের পাশে বসে ডিনার খেতে তাঁরা যথেষ্টই বিরক্ত হচ্ছিলেন। হয়ত বিরক্ত হচ্ছিলেন প্রিয়তোষের ওপরেও। তিনি এমন একটি ম্যানার্স-না-জানা হাভাতে টাইপের ছোকরাকে খাবার টেবলে এনে তুলেছেন বলে। বারকয়েক মল্লিনাথের দিকে তাকাবার পর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনুরাধা এবং চন্দ্রাবতী কী একটা ভ্যারাইটি শো-এর ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

বুকে যাঁর পেস-মেকার বসানো তাঁর ডায়েট খুব কড়াকড়ির মধ্যেই থাকে। প্রিয়তোষ একটু চিকেন সুপ, সামান্য স্যালাড, একটু ছানা আর দু'টুকরো মাখনহীন কড়া টোস্ট ছাড়া আর কিছু নেন নি। এক চামচ ছানা মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে তিনি বলেছেন, 'চার ইউনিটের চার ওয়ার্কস ম্যানেজার প্রবাল গুপ্ত, মনোতোষ গাঙ্গুলি, রজত দত্ত, সৌমেন চাকলাদার আর অ্যাকাউন্টস অফিসার রবীন সান্যাল—এই ক'জন সম্পর্কে তোমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

একটা ব্যাপারে বেশ মজা লাগছিল মল্লিনাথের। একই টেবলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো তিনি আর প্রিয়তোষ এক দিকে, আরেক দিকে অনুরাধা আর চন্দ্রাবতী। একেবারে আলাদা আলাদা বিষয়ে তাঁরা কথা বলছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে তাঁদের যেন কোনোরকম পরিচয় নেই—একেবারেই যোগাযোগহীন, সম্পর্কশূন্য।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চন্দ্রাবতী মল্লিনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তা হলে তুমি আমাদের কোম্পানিতে কবে জয়েন করছ?'

প্রশ্নটা এতই অপ্রত্যাশিত যে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। গোড়া থেকেই চন্দ্রাবতী ছিলেন তাঁর ব্যাপারে পুরোপুরি নিরুৎসুক। নগদ প্রাপ্তি হিসেবে উপেক্ষা ছাড়া তাঁর কাছ থেকে তখন পর্যন্ত আর কিছু জোটে নি। কিন্তু আচমকা কী কারণে ভদ্রমহিলার মনোভাব কয়েক মিনিটের ভেতর বদলে গিয়েছিল বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

মল্লিনাথ উত্তর দেবার আগেই প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'কাল থেকেই শুরু করে দাও। আর দেরি করে দরকার নেই।'

স্বামীর দিকে তাকান নি চন্দ্রাবতী। প্রিয়তোষের কথা শেষ হতে না হতেই মল্লিনাথের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?'

চন্দ্রাবতীর এ জাতীয় কৌতূহলের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না মল্লিনাথ। বিমূঢ়ের মতো তিনি ভাই, মা এবং বিবাহিত বোনেদের কথা জানিয়েছিলেন।

চন্দ্রাবতী বলেছিলেন, 'আই সী। তোমার বাবা কী করতেন?'

'সামান্য স্কুল টিচার ছিলেন।'

'আই সী।'

চন্দ্রাবতীর প্রশ্নগুলির মধ্যে নেহাত কৌতূহল নয়, সূক্ষ্মভাবে আরো কিছু লুকনো ছিল। প্রিয়তোষ কিছুটা বিব্রত বোধ করে থাকবেন। তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'এসব জেনে কী হবে? টোটালি মীনিংলেস। মহিলা হলেও এই ধরনের কিউরিওসিটি তো তোমার কোনোদিন ছিল না।'

চন্দ্রাবতী ঠাণ্ডা চোখে স্বামীকে লক্ষ করতে করতে বলেছেন, 'তুমি কাকে বাড়িতে এনে ডিনার খাওয়াচ্ছ তার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিতে হবে না?' বলতে বলতে তাঁর চোখে মুখে শীতল হাসি ফুটে উঠেছে। সেই হাসির মধ্যে কোথায় যেন এক ধরনের নিষ্ঠুরতা লুকনো ছিল।

মহিলা যে খুবই অহঙ্কারী, সোসাইটিতে নিজেদের ক্লাস এবং স্টেটাস সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, সেটা নতুন করে টের পাওয়া যাচ্ছিল। চড়া গলায় তিনি কথা বলছিলেন না, কণ্ঠস্বরকে খুবই নিচু পর্দায় বেঁধে রেখেছিলেন। তবু তাঁর তাকানো, কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে দাম্ভিকতা মেশানো ছিল। অহঙ্কারকে কখনও উগ্র-ভাবে, আবার কখনও সূক্ষ্ম চারুকলার মতো প্রকাশ করতে জানতেন চন্দ্রাবতী।

স্ত্রীর দিকে ফিরে প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'আমাদের দরকার মল্লিনাথকে নিয়ে। ওর ফ্যামিলির ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে।' বোঝা যাচ্ছিল, চন্দ্রাবতীর ওপর বেশ ক্ষুব্ধ আর বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি।

এদিকে শান্ত, ভদ্র, ভালমানুষ মল্লিনাথের মাথায় হঠাৎ প্রচণ্ড এক জেদ চেপে বসেছিল। জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ ঢোকার পর কোম্পানিটাকে ভালভাবে চালাতে কতদূর কী করতে পারবেন তখনও তিনি জানেন না। তবে সেই মুহূর্তে স্থির করে ফেলেছিলেন, চন্দ্রাবতী মল্লিক নামে মহিলাটির দম্ভ যেভাবে হোক, চুরমার করতেই হবে।

প্রায় মরিয়া হয়েই যেন এবার মল্লিনাথ চন্দ্রাবতীকে বলেছিলেন, 'আপনি আমার সম্বন্ধে সামান্যই জেনেছেন। তবু আরো স্পষ্ট করে বলছি, অবশ্য সেভাবে বলার মতো আমাদের ভাল পেডিগ্রি নেই, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, 'অভিজাত' শব্দটা শুধু বইতেই পড়েছি, লোয়ার মিডল ক্লাসের সব চেয়ে নিচের লেভেলের মানুষ আমরা। এই হল আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড। আর আপনি তো জানেন আমি মল্লিকসাহেবের কৃপাপ্রার্থী, একজন নাম-করা প্রফেসরের সুপারিশে চাকরির জন্যে তাঁর কাছে কয়েক মাস ধরে ঘোরাঘুরি করছি। আশা করি, আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা এবার পরিষ্কার হবে।' ঝোঁকের মাথায় কথাগুলো বলেই হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয়েছিল, এভাবে, এত খোলাখুলি না বললেই ভাল হ'ত। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না, বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে গেছে।

চন্দ্রাবতী উত্তর দেন নি, শীতল উপেক্ষায় মল্লিনাথকে দেখতে

দেখতে ধীরে ধীরে অনুরাধার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন যে গরীব যুবকটি চাকরির উমেদার হয়ে এসেছে, সে ঘাড় ঝুঁকিয়ে মুখ বুজে সব মেনে নেবে না। মল্লিনাথের এই ঔদ্ধত্য তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু উত্তাপ আর ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বাইরে তার বিস্ফোরণ ঘটাতে দেন নি।

এরপর প্রায় চুপচাপ সবাই খেয়ে যাচ্ছিলেন। কাঁটা-চামচের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না। চন্দ্রাবতী আর মল্লিনাথ যখন কথা বলছিলেন, প্রিয়তোষ নীরবে শুনেই গেছেন, কোনোরকম মন্তব্য করেন নি। তাঁর মুখ দেখে মনোভাব বোঝা যাচ্ছিল না।

মল্লিনাথ বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলেন। চন্দ্রাবতীকে তিনি যে খোঁচাটা দিয়েছিলেন সেটা এতই স্পষ্ট যে কারো বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল, প্রিয়তোষ এটা ভালভাবে নেন নি। একজন চাকরির উমেদার স্ত্রীর মুখের ওপর এভাবে কথা বলবে, সেটা কারো পক্ষেই প্রীতিকর নয়। মল্লিনাথ এরপর ধরেই নিয়েছিলেন, জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ তাঁর চাকরি পাওয়ার আশা নেই।

ডিনার শেষ হওয়া মাত্র মল্লিনাথ বলেছিলেন, 'আমি এবার যাব।'

'আচ্ছা—' প্রিয়তোষ তাঁর সঙ্গে নিচে নামার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে বলেছিলেন, 'কাল দশটায় অফিসে চলে এসো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা ওখানেই পেয়ে যাবে।'

রীতিমতো অবাক হয়ে প্রিয়তোষের দিকে তাকিয়েছিলেন মল্লিনাথ। তাঁর কাঁধে সস্নেহে একটা হাত রেখে বলেছেন, 'তুমি অন্যায় কিছু করো নি। চন্দ্রাবতীকে যা বলেছ তাতে তোমার ওপর আমার আস্থা বেড়ে গেছে। ওভাবে না বললে মনে হ'ত তোমার মেরুদণ্ড নেই, য়ু আর আ স্পাইনলেস চ্যাপ—আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে শুধু চাকরির জন্যেই এসেছ।'

মল্লিনাথ অভিভূত। প্রিয়তোষ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই মানুষটি কোন ধাতুতে তৈরি আন্দাজ

করে কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল জেনিথ এন্টারপ্রাইজেসকে তিনি ধ্বংসের কিনার থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। প্রিয়তোষ তাঁর মধ্যে অনেকখানি সাহস যেন চারিয়ে দিয়েছিলেন।

মল্লিনাথের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ ছিল না প্রিয়তোষের। একটা বেয়ারাকে ডেকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ নিচে কোন ড্রাইভার আছে। তাকে বলবি এই সাহেবকে যেন ওঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।'

সেদিন রাতে বাড়ি যেতে যেতে মল্লিনাথ আবছাভাবে আরো একটা কথা ভেবেছিলেন, স্ত্রীর সঙ্গে প্রিয়তোষের সম্পর্কটা হয়ত ভাল নেই। মনে পড়ে গিয়েছিল, ড্রইং রুমে দেখা হবার পর থেকে যতক্ষণ ও বাড়িতে ছিলেন, একটা কথাও বলেন নি অনুরাধা। দু-একবার অসীম উদাসীনতায় তাঁর দিকে তাকানো ছাড়া একটি কথাও বলেন নি। মল্লিনাথ সম্পর্কে তিনি ছিলেন একেবারেই আগ্রহশূন্য।

পরদিনই জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ জয়েন করেছিলেন মল্লিনাথ। তাঁর ডেজিগনেসন ছিল একজিকিউটিভের। কোনো বিশেষ বিভাগে তাঁকে আটকে রাখা হয় নি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে পরিষ্কার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ যত ডিপার্টমেন্ট আছে, সবগুলোর মধ্যে তিনি কো-অর্ডিনেটরের কাজ করবেন। শুধু তা-ই নয়, প্রিয়তোষ সারা অফিসে সার্কুলার জারি করে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট মল্লিনাথকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। তিনি যখন যে কাগজপত্র দেখতে চাইবেন, দেখাতে হবে। যদি কাউকে কোনো পরামর্শ দেন, কোম্পানির স্বার্থে তা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ বিপুল ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

একটা আনকোরা নতুন লোক—তা-ও বয়স এত কম, সবে ইউনিভার্সিটি থেকে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়েছে—তার খবরদারি মুখ বুজে মেনে নিতে কোনো ডিপার্টমেন্টের টপ অফিসাররা রাজী ছিল না। সমস্ত কোম্পানি জুড়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারত। কিন্তু মল্লিনাথের মাথা বরাবর খুব ঠাণ্ডা। সহজে বিচলিত

হন না।

তিনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর ইউনিয়ন এবং এমপ্লয়ীদের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। সেটা অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়তোষ। দুটো ইউনিয়ন ছিল কোম্পানিতে। এমনিতে তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, অন্য পক্ষ থেকে মেম্বার ভাঙিয়ে নিজেদের আধিপত্য বাড়াবার ব্যাপারে মাঝে মাঝে তুমুল গোলমাল বেধে যেত। স্লোগান, গেট মিটিং ইত্যাদি তো ছিলই। মাঝে মাঝে দু পক্ষে প্রচণ্ড বোমাবাজিও চলত। কিন্তু জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস বন্ধ হয়ে যাক, কয়েক শ' এমপ্লয়ী ছেলেমেয়ে নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ুক, তারা একেবারেই চাইত না। সমস্যা কেটে গিয়ে কোম্পানি আগের মতো ভালভাবে চলুক, এটাই ছিল তাদের কাম্য।

জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ জয়েন করার ঠিক দশদিন বাদে দুই ইউনিয়নের সেক্রেটারি রণদেব বসু আর সুশীল পুরকায়স্থকে নিয়ে জরুরি মীটিংয়ে বসেছেন মল্লিনাথ।

সোজাসুজি মল্লিনাথ কোম্পানির যাবতীয় সমস্যা জানিয়ে দুই সেক্রেটারিকে বলেছেন, 'আপনাদের সাহায্য না পেলে কোম্পানি বাঁচানো যাবে না। অনেক আশা নিয়ে মল্লিকসাহেব আমাকে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ এনেছেন। যদি কো-অপারেট করেন আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। নইলে রেজিগনেসান দিয়ে চলে যাব।'

সুশীল পুরকায়স্থ এবং রণদেব বসু জানতে চেয়েছিলেন, 'কী ধরনের সাহায্য আপনি চান?'

মল্লিনাথ জানিয়েছিলেন, আপাতত যে অফিসারেরা নানাভাবে কোম্পানির ক্ষতি করে চলেছে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর স্টেপ নিতে চান। দুই ইউনিয়ন এ ব্যাপারে যেন তাঁকে সমর্থন করে।

তৎক্ষণাৎ কোনো কথা দেন নি সুশীল এবং রণদেব। আসলে তাঁরা মল্লিনাথকে একটু বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে কতটা সদিচ্ছা আছে, আদৌ আছে কিনা, নতুন এই একজিকিউটিভ ভাঁওতা দিয়ে তাঁদের কোনো ফাঁদে ফেলতে চায় কিনা,

সেটা তো বুঝে নেওয়া দরকার। যাই হোক, আরো তিন চারবার মিটিংয়ের পর রণদেবরা রাজী হয়েছিলেন।

এরপর ছ'মাসের মধ্যে কোম্পানির সমস্যা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। তবে খুব সহজে নয়। যে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থকে মল্লিনাথ চুরমার করে দিতে চেয়েছিলেন তারা সুবোধ বালকের মতো এক কথায় ঘাঁটি ছেড়ে দেয় নি। ঘুঘুর বাসা ভাঙা সোজা ব্যাপার নয়। লোকগুলো মল্লিনাথকে খুন করার পরিকল্পনা পর্যন্ত করেছিল। একদিন রাত্তিরে কোম্পানির একটা ফ্যাক্টরি দেখে যখন কলকাতায় ফিরে আসছেন দিল্লী রোডে এক বিশাল লরী প্রচণ্ড স্পীডে তাড়া করে তাঁদের ছোট ফিয়েট গাড়িটাকে ধাক্কা দিতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য, মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট ঘটানো। দুর্ঘটনাটি ঘটাতে পারলে ফিয়েটটা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। মল্লিনাথের মৃত্যু ছিল একরকম অবধারিত। কিন্তু তাঁর ড্রাইভার ব্যাপারটা আঁচ করে দ্রুত একটা সরু রাস্তায় গাড়িটাকে ঢুকিয়ে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে কলকাতায় চলে এসেছিল। প্রকাণ্ড লরীটা অত দ্রুত টার্ন নিয়ে তাদের পিছু নিতে পারে নি। আরেক বার অনেক রাত্তিরে নিজেদের বাড়ির জানালার সামনে বসে কোম্পানির কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন মল্লিনাথ। একটা গুলি সাঁই করে বাইরে থেকে এসে তাঁর বাঁ কাঁধের পাশ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে লেগেছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। প্রথম দিকে একটু ভয় পেয়েছিলেন কিন্তু পরে মারাত্মক জেদ যেন মাথায় চেপে বসে। প্রতিপক্ষ কতদূর যেতে পারে সেটা না দেখে তিনি ছাড়বেন না। চ্যালেঞ্জ যখন নিয়েছেন তখন মাঝপথে সব ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটা নিছক কাপুরুষতা। এরকম একটা বদনাম নিয়ে তাঁর পক্ষে সরে যাওয়া অসম্ভব।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা কোর্ট অব্দি গড়ায়। যে পাঁচ অফিসার নানা কুকীর্তির নায়ক তাদের বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে অনায়াসেই পাঁচ সাত বছর করে জেল খাটানো যেত। সেটা আন্দাজ করেই খুব সম্ভব কোম্পানির কাছে মুচলেকা দিয়ে তারা রেজিগনেসান দেয়। মল্লিনাথ এই ব্যাপারটার জের টানতে চান নি। কেন না, তাঁর সামনে অনেক কাজ।

একটা বড় বাধা পেরুনো গেছে। এবার প্রোডাকসানের দিকে নজর দিতে হবে। ব্যাঙ্কের কাছে যে ঋণ আছে তা শোধ করতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা, জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর হারানো সুনাম ফিরে পেতে হবে।

এরপর সময় যে কিভাবে কেটে গেছে, নিজেই টের পেতেন না মল্লিনাথ। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত শুধু কাজ আর কাজ। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে দিনের পর রাত আসত, রাতের পর দিন। ঘুম বিশ্রাম আরাম, এসব ব্যাপারগুলোকে ধারেকাছে ঘেঁষতে দিতেন না মল্লিনাথ। এই পরিশ্রমের ফলও পাওয়া যাচ্ছিল।

বছর দেড়েকের মধ্যে কোম্পানির চেহারা পুরোপুরি বদলে গেছে। নতুন করে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর ওপর সবার আস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছিল। যে পুরনো ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারা তো ফিরে এসেছিলই, বম্বে দিল্লী মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ থেকে নতুন নতুন ক্লায়েন্টের অর্ডারও আসতে শুরু করেছিল। জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সম্পর্কে তখন কারো আর সংশয় ছিল না।

এই সময়টা সারা ভারতবর্ষ ব্যবসা বাড়াবার জন্য ছুটে বেড়াতে হ'ত মল্লিনাথকে। দু'দিন কলকাতায় থাকলে পাঁচদিন থাকতে হ'ত বাইরে—হয় দিল্লী, নয় বম্বে, অথবা ব্যাঙ্গালোরে।

কোম্পানির বিজনেস হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। এর ফাঁকে ফাঁকে নতুন নতুন ইউনিট বসাবার পরিকল্পনাও চলছিল। দু' বছরের মাথায় একটা সিক স্টীল রেলিং মিল ওঁরা জলের দরে কিনে নিয়েছিলেন। আগে যাদের হাতে ঐ কোম্পানিটা ছিল তাদের ম্যানেজমেণ্ট একেবারেই প্রোফেসানাল নয়, তার ওপর ছিল দশ হাতে চুরি। সেই রুগ্‌ণ ইণ্ডাস্ট্রির চেহারা কয়েক মাসের মধ্যে পালটে দিয়েছিলেন মল্লিনাথ। তাছাড়া শ্রীরামপুরে, খড়দায় আর পানিহাটিতে জায়গা কিনে একটা রংয়ের কারখানা, একটা কাগজ কল আর জাপানি কোলাবোরেসনে কালার টিভি'র ফ্যাক্টরি বসানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। ব্যাঙ্কের আগেকার ঋণ তখনও সবটা শোধ হয় নি। কিন্তু যেভাবে নিয়মিত ইনস্টলমেন্টে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে কোম্পানির, বিশেষ

করে মল্লিনাথের ওপর ব্যাঙ্ক অথরিটির আস্থা বেড়ে গিয়েছিল। তারা নতুন ইউনিটগুলোতে অজস্র টাকা দিতে শুরু করেছিলেন।

প্রিয়তোষ মল্লিক যদিও টাটা বিড়লাদের মতো বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নন, ওঁদের তুলনায় তিনি একেবারেই নগণ্য, তবু দেশের বিরাট বিরাট শিল্পপতি, নানা চেম্বার অফ কমার্স এবং স্টক মার্কেটের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। স্টেট এবং সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের ট্রেড ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্স ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, ডিরেক্টর আর অন্যান্য বড় বড় অফিসারদের অনেকেই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কেন না কলকাতায় ও দিল্লীতে পড়াশোনা এবং রীসার্চ করেছেন প্রিয়তোষ। তখন এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন তাঁর সহপাঠী বা দু-চার বছরের জুনিয়র। মানুষ হিসেবে প্রিয়তোষ ছিলেন অত্যন্ত সৎ, বন্ধুবৎসল, অমায়িক। ফলে সবাই তাঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। এই সম্পর্কটা পরবর্তী সময়েও অটুট ছিল।

সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ইণ্ডাস্ট্রি আর বিজনেস ওয়ার্ল্ডের এইসব মানুষদের সঙ্গে মল্লিনাথের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়তোষ। এইসব যোগাযোগ না ঘটলে পরে এতটা ওপরে ওঠা সম্ভব হ'ত না। উঁচুতে ওঠার পক্ষে যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হল কনট্যাক্ট। যোগাযোগের এই সিঁড়িটি ছাড়া বিরাট মাপের সাফল্যের অন্য কোনো রাস্তা নেই, এমনকি যার যত বড় যোগ্যতাই থাক না কেন।

জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর মতো মল্লিনাথের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন কিন্তু তেমন উল্কার গতিতে ছুটছিল না। কিছু পরিবর্তন অবশ্য ঘটেছিল কিন্তু সেটা তেমন চমকপ্রদ নয়।

আগে তাঁরা এক দমচাপা সরু গলির ভেতর বস্তি টাইপের একটা বাড়িতে দু'খানা ঘর নিয়ে আরো দশটা ভাড়াটের সঙ্গে থাকতেন। কোম্পানি এবার তাঁকে যোধপুর পার্কে একটা ভাল ফ্ল্যাট দিয়েছিল। সেখানে মা আর ভাইকে নিয়ে এসে উঠেছিলেন মল্লিনাথ। ফ্ল্যাট ছাড়া গাড়িও দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ছোট ভাই পিনাকেশও লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট। মল্লিনাথ কোনো অনুরোধ

করেন নি কিন্তু পিনাকেশ ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তোষ তাকে ডাকিয়ে এনে তাঁর কোম্পানিতে ভাল একজিকিউটিভ পোস্টে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

পিনাকেশ মল্লিনাথের মতো নয়। চতুর বলাটা হয়ত ঠিক হবে না, তবে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। স্বার্থের ব্যাপারটা সে খুব ভাল বুঝত, বাস্তববোধ অত্যন্ত প্রখর। মল্লিনাথদের দুই ভগ্নিপতি সামান্য চাকরি করত। পিনাকেশ প্রিয়তোষকে ধরে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ তাদের দামী পোস্টে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে প্রিয়তোষদের নিউ আলিপুরের বাংলোয় মল্লিনাথ কত বার এসেছেন তার ঠিক নেই। কলকাতায় থাকলে রোজই যেতেন। কেননা অফিসে ম্যানেজমেন্টের নানা ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হ'ত যে ঠান্ডা মাথায় অন্য কিছু নিয়ে আলোচনার সময় পাওয়া যেত না। কোম্পানির পলিসি, তার এক্সপ্যানসান, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে তাই নিউ আলিপুরে গিয়ে প্রিয়তোষের সঙ্গে বসতে হ'ত।

এই নিয়মিত যাতায়াতের কারণে চন্দ্রাবতী আর অনুরাধাকে আরো ভালভাবে দেখার বা জানার সুযোগ হয়েছিল।

জেনিথ এন্টারপ্রাইজেসকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে মল্লিনাথ যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে একটা সম্মান-জনক জায়গায় তাকে পৌঁছে দিয়েছেন সে জন্য বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই চন্দ্রাবতীর। ফিউডাল রক্ত আগের মতোই তাঁর শিরায় শিরায় সবেগে এবং সদর্পে বয়ে যাচ্ছিল। তিনি মল্লিনাথকে নিজেদের একজন এমপ্লয়ী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না। পেডিগ্রি বা বংশমহিমার চেয়ে বড় কিছু তাঁর কাছে ছিল না।

প্রিয়তোষ প্রায়ই উচ্ছ্বসিতভাবে বলতেন, 'মল্লিনাথের জন্যে কোম্পানিটা বেঁচে গেল। চোখের সামনে নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। ও সেটাকে গ্লোরিয়াস পজিসানে তুলে এনেছে।'

শুনে স্থির চোখে একবার স্বামীকে, আরেক বার মল্লিনাথকে দেখতেন চন্দ্রাবতী। তারপর বলেন, 'এটা ওর ডিউটি। হী ইজ প্রফিউজলি পেইড ফর ইট।'

অর্থাৎ মল্লিনাথ যতই যা করুন না কেন, চন্দ্রাবতীর কাছে একজন ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নন।

প্রিয়তোষ ক্ষুব্ধ হতেন। বলতেন, 'এভাবে তোমার বলা উচিত নয় চন্দ্রা। আমাদের কোম্পানিতে আরো অনেক পেইড লোক আছে কিন্তু তাদের একজনেরও মল্লিনাথের মতো ট্যালেন্ট নেই। হী ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি।'

চোখ সামান্য কুঁচকে; ঠোঁটে অদ্ভুত শীতল হাসি ফুটিয়ে চন্দ্রাবতী বলতেন, 'এই ছেলেটার পেছনে তুমি যত টাকা ঢেলেছ, যে সুযোগ তাকে দিয়েছ, সেরকম অন্য কাউকে দিলে রেজাল্ট একই রকম হ'ত।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

'একজাক্টলি।'

প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও প্রিয়তোষ ছিলেন খুবই ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ। কণ্ঠস্বর কখনও বিশেষ একটা পর্দার ওপর তুলতেন না। বলতেন, 'তোমার কোনো ধারণাই নেই এই ছেলেটার মধ্যে কী ক্ষমতা রয়েছে। মল্লিনাথকে না পাওয়া গেলে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস শেষ হয়ে যেত—আ সার্টেন ডেথ।'

চন্দ্রাবতী বলতেন, 'তোমাকে আমি দেখিয়ে দেবো, যে কোনো মানুষকে অপরচুনিটি দিলে সে অনেক কিছুই করতে পারে। অ্যাট লিস্ট আরেকটা মল্লিনাথ তৈরি করা এমন কোনো ব্যাপারই নয়।'

'তোমার 'হোম'-এর ছেলেদের কথা বলছ?'

চন্দ্রাবতী বিচিত্র চরিত্রের মহিলা। তাঁর মানসিকতার মধ্যে নানা ধরনের জটিলতা রয়েছে। তিনি অভিজাত বংশের মানুষ, সোসাইটির সব চেয়ে উঁচু লেভেলে তাঁর যাতায়াত। প্রায়ই পার্টিতে যেতেন। ড্রিংক করলেও মাতাল হতেন না। তাঁকে বাদ দিয়ে কলকাতার হাই সোসাইটিতে কোনো অনুষ্ঠান হবার উপায় ছিল না। এ জাতীয় জীবনযাত্রার উত্তরাধিকার নিয়ে একদা শ্বশুর-বাড়িতে এসেছিলেন চন্দ্রাবতী। অনুরাধাকে তিনি নিজের ছাঁচেই ঢালাই করে নিয়েছিলেন।

প্রিয়তোষ কখনও কিছু মুখ ফুটে প্রকাশ করেননি। তবে

স্ত্রী এবং মেয়ের প্রতি তিনি যে খুশি নন, সেটা অনুমান করতে পারতেন মল্লিনাথ।

উন্নাসিকতা, আভিজাত্যের উগ্র দম্ভ, বংশপরিচয়হীন মানুষের প্রতি উপেক্ষা—এ সব ছাড়া চন্দ্রাবতীর চরিত্রের আরেকটা দিক একেবারেই অভাবনীয়। তিনি রাস্তার অনাথ ছেলেদের জোগাড় করে একটা 'হোম' করেছিলেন। তিনি আর অনুরাধা এটা চালাতেন। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে আরো অনেকেই ছিল, বিশেষ করে হাই সোসাইটির কিছু যুবক। সমাজসেবা নয়, তাদের একমাত্র লক্ষ ছিলেন অনুরাধা। তাঁর জন্য এই যুবকদের মধ্যে একটা চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

'হোম' চালানোর মনস্তত্ত্বটা অদ্ভুত। অভিজাত বংশের মানুষ হয়েও তিনি যে খানিকটা সোসাল ওয়ার্ক করতেন, এর জন্য সারা পৃথিবীর কৃতার্থ হওয়া উচিত—হয়ত এরকম কিছু একটা তিনি ভাবতেন। কাউকে করুণা করছেন, এতে তাঁর অহমিকা খুব সম্ভব পরিতৃপ্ত হ'ত। তা ছাড়া চন্দ্রাবতীর 'হোম' নিয়ে খবরের কাগজে প্রায়ই বিরাট বিরাট লেখা আর ছবি বেরুত। অন্যান্য মীডিয়া-গুলোও পিছিয়ে থাকত না, তারাও ফলাও প্রচার চালিয়ে যেত। মহিলা এবং তাঁর মেয়ে অনুরাধার নাম যশ আর পাবলিসিটির ব্যাপারে ছিল ভীষণ দুর্বলতা। এ জন্য প্রায়ই মীডিয়ার লোকদের ডেকে বাড়িতে পার্টি দিতেন। তাদের যথেষ্ট তোয়াজ করে চলতেন। নগদ নগদ তার ফলও পাওয়া যেত।

মল্লিনাথের সম্পর্কে চন্দ্রাবতীর প্রথম দিনের সেই মনোভাবটা বরাবর একই রকম ছিল। জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এ জয়েন করার পর নিয়মিত দিনের পর দিন নিউ আলিপুরে গেছেন তিনি। শীতল অবজ্ঞা ছাড়া চন্দ্রাবতীর কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যায়নি।

মায়ের মতো অতটা তীব্র না হলেও অনুরাধাও মল্লিনাথকে নিজেদের একজন কর্মচারী ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না। বাবার উদারতা, সৌজন্য. কৃতজ্ঞতাবোধ—এ সবের প্রায় কোনোটাই পাননি তিনি। বরং মায়ের নীল রক্তের সবটুকু অহঙ্কার এবং দাম্ভিকতা তাঁকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল।

অনুরাধার সঙ্গে ক'টা কথা হয়েছে, আঙুলে গুনে বলে দিতে পারেন মল্লিনাথ। নিউ আলিপুরে গেলে বেশির ভাগ দিনই অনুরাধাকে দেখা যেত না, মায়ের সঙ্গে তিনি বাইরে বাইরেই কাটাতেন। ক্বচিৎ কখনো দেখা হলে পরস্পরের দিকে অপরিচিতের মতো তাকাতেন শুধু। যেন তাঁরা বহু দূরবর্তী দুই অচেনা গ্রহের বাসিন্দা।

যতই অনুরাধা অবজ্ঞা করুন, মল্লিনাথ ভেতরে ভেতরে তাঁর প্রতি এক ধরনের অদম্য আকর্ষণই অনুভব করতেন। মনস্তত্ত্ব একটা অদ্ভুত জটিল ব্যাপার। যেখান থেকে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য আসে, মানুষ বুঝিবা সেদিকেই বেশি করে ঝুঁকে পড়ে। কবে থেকে অনুরাধা তাঁর চিন্তার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন, মল্লিনাথ জানেন না। একেক দিন গভীর রাতে অফিসের কাগজপত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন তিনি। কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, হঠাৎ অনুরাধার মুখ তাঁর চোখের সামনে তখন ফুটে উঠেছে।

প্রথম দিকে নিউ আলিপুরে অফিসের ব্যাপারে প্রিয়তোষের সঙ্গে আলোচনা করতেই যেতেন। জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস ছাড়া তখন তাঁর মাথায় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একেক দিন তিনি আবিষ্কার করতে লাগলেন, নিতান্ত অকারণেই নিউ আলিপুরে চলে গেছেন। যে উদ্দেশ্যে তাঁর যাওয়া সেটা এমনই তুচ্ছ যে প্রিয়তোষের পরামর্শের প্রয়োজনই নেই। নিজেই তিনি সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিংবা প্রিয়তোষকে সামান্য একটা টেলিফোন করলেই কাজ হয়ে যায়।

এভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর তাঁর মনে হয়েছিল, প্রতিদিন একবার করে তিনি যে নিউ আলিপুর যান তার একটা বড় কারণ অনুরাধা। রোজ অনুরাধার সঙ্গে যে দেখা হ'ত, তা নয়। তবু কলকাতা মেট্রোপলিসে রাত নামলেই নিউ আলিপুর প্রচণ্ড আকর্ষণে তাঁকে সেদিকে টেনে নিয়ে যেত।

কোনো কোনো দিন নিজের অজান্তেই হয়ত মল্লিনাথ অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করে বসতেন, 'আপনাদের 'হোম'-এর কাজ কেমন চলছে?'

রীতিমত অবাকই হয়ে যেতেন অনুরাধা। আসলে মল্লিনাথ যে যেচে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তাঁর কাছে এটা একেবারেই অভাবনীয়। চোখের কোণ দিয়ে মল্লিনাথকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করতেন, 'আপনি রেগুলারলি খবরের কাগজ পড়েন? রেডিও শোনেন? টিভি দেখেন?'

মল্লিনাথ হকচকিয়ে যেতেন, 'মানে!'

'ওগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে জানতে পারতেন, আমাদের 'হোম' কেমন চলছে।'

একদিন মলিনাথ বলেছিলেন, 'আপনি এম. এ'তে তো খুব ভাল রেজাল্ট করেছিলেন?'

নিরুৎসুক মুখে অনুরাধা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনাকে এই ইনফরমেসনটা কে দিলে?'

'দিয়েছে কেউ—'

'বা, আমার সম্বন্ধে বেশ খবর-টবর রাখতে শুরু করেছেন দেখছি। এনিওয়ে কী বলতে চাইছেন?'

মল্লিনাথ বলেছেন, 'আপনার মতো ছাত্রীর রীসার্চ করা উচিত।'

দুই চোখ কুঁচকে এবার সরু হয়ে গেছে অনুরাধার। তীক্ষ্ণ চোখে মল্লিনাথের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে কণ্ঠস্বর সামান্য উঁচুতে তুলে এবার বলেছেন, 'সেদিন বাবার কাছে শুনছিলাম, কোম্পানির টার্নওভার এ বছর নাকি আট কোটি টাকায় তুলতে হবে?'

মল্লিনাথ চকিত হয়ে বলেছেন, 'আপনি কোম্পানির খবর রাখেন?'

'কোম্পানিটা যখন আমাদের তখন খবর রাখতে হয় বৈকি।' গম্ভীর সুরে অনুরাধা জিজ্ঞেস করেছেন, 'টার্নওভারের যে টার্গেট ঠিক করা হয়েছে, আশা করি সেখানে পৌঁছুনো যাবে।'

মল্লিনাথ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে যে অপমানিত হতে হবে তা ভাবতে পারেন নি তিনি।

অনুরাধা থামেননি, ঠাণ্ডা নির্মম স্বরে বলেছেন, 'ইয়ার এন্ডিংয়ের মোটে আড়াই মাস বাকি। এর ভেতর আরো তিন কোটি

টাকার বিজনেস করতে হবে। এই ব্যাপারটা সব সময় মাথায় রাখবেন।'

কোনো উত্তর দিতে পারেন নি মল্লিনাথ। শুধু তাঁর নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর জন্য তিনি যা-ই করে থাকুন না কেন, অনুরাধা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কটা একেবারেই প্রভু-ভৃত্যের। এরপরও প্রতিদিন সন্ধের পর অনিবার্য নিয়মে কোন এক অদৃশ্য নিয়তি তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে নিউ আলিপুরে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনে আছে, বছর পাঁচেক এভাবে কাটার পর হঠাৎ একদিন চন্দ্রাবতীর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতে পুরোপুরি অসাড় হয়ে যায়। যে মানুষটা—যতই ব্লু ব্লাডের অহমিকা থাক—দিনরাত কলকাতার ফুটপাথ থেকে সবচেয়ে উঁচু লেভেলে ঘুরতেন, অসম্ভব কর্মক্ষম আর তৎপর ছিলেন—সেই তিনিই কিনা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। প্রথম মাস দেড়েক একেবারেই কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিন নার্সিং হোমে কাটিয়ে, নিয়মিত ফিজিওথেরাপি করবার পর অল্প অল্প দুর্বোধ্য, জড়ানো আওয়াজ বেরুত। নীল রক্তের দর্প এবং প্রতাপ বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল।

স্ত্রীর অনেক কিছুই পছন্দ করতেন না প্রিয়তোষ। স্বভাব, আচার-ব্যবহার, সব দিক থেকেই তাঁরা দুই মেরুর মানুষ। কিন্তু চন্দ্রাবতীকে তিনি যে ভালবাসতেন, সেটা পাঁচ বছরে টের পেয়ে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। স্ত্রীর প্যারালিসিস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারাত্মক- ভেঙে পড়েছেন। বুকে পেসমেকার বসানো ছিল ঠিকই, কিন্তু আবার হার্টে কষ্ট শুরু হয়েছিল। ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছিল, তাঁর পক্ষে মস্তিষ্কের কাজ ভয়ানক ক্ষতিকর। তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

যিনি ছিলেন আজীবন যোদ্ধা, কোনো কারণেই লড়াইয়ের মাঠ ছেড়ে সরে যান নি, সেই প্রিয়তোষের দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। স্ট্রোকের পর স্বাস্থ্য তো শেষ হয়ে গিয়েছিলই, এবার মনের জোরটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলেন চন্দ্রাবতী আর

তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর আগে দুটো কাজ তাঁকে করতে হবে। সে দুটো হল জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস আর অনুরাধার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন। চরম দুর্দিনেও সেটা বন্ধ করে দেন নি। প্রিয়তোষ জানতেন তাঁর এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসটাকে একমাত্র বাঁচিয়ে রাখতে পারেন মল্লিনাথ। শুধু তাই না, যেভাবে এক্সপ্যানসান হচ্ছে তাতে সব কিছু ঠিকমতো চললে তাঁর কোম্পানি পাঁচ দশ বছরে দেশের প্রথম একশ'টা বিগ হাউসের মধ্যে জায়গা করে নেবে। অবশ্য তিনি তখন বেঁচে থাকবেন না।

জেনিথ এন্টারপ্রাইজেসকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হল মল্লিনাথকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা। বহুদিন ধরেই মনে মনে প্রিয়তোষ ঠিক করে রেখেছিলেন, অনুরাধার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবেন। তবে মল্লিনাথ সম্পর্কে মেয়ের মনোভাব কী, সেটা প্রিয়তোষের অজানা ছিল না। তিনি এটাও জানতেন অনুরাধার প্রচুর অ্যাডমায়ারার, দিনরাত তাঁর চারপাশে তারা মাছির মতো ভন ভন করে। অবশ্য এরা পয়সাওলা বনেদী পরিবারের ছেলে, দারুণ অ্যারিস্টোক্রাট কিন্তু একেবারেই অপদার্থ, গিল্টি-করা গয়নার মতো ওপরটা চকচকে, ভেতরে সারবস্তু কিছুই নেই। অনুরাধা এদের কাউকে বিয়ে করলে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস স্বাভাবিক নিয়মেই তার হাতে চলে যাবে। কিন্তু এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস চালানো এদের পক্ষে অসম্ভব।

অনুরাধার দাম্ভিকতা যে ধরনের তাতে অন্য কাউকে বিয়ের পর কোম্পানির ওপর মল্লিনাথের কর্তৃত্ব মেনে নেবেন, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। তাই তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের যে ছকটা দূরদর্শী প্রিয়তোষ করে রেখেছিলেন সেটা একরকম ডিপ্লোম্যাটিক ম্যারেজই বলা যেতে পারে।

মল্লিনাথ শুনেছেন মেয়ের সঙ্গে এই বিয়ের ব্যাপারে কথা হয়েছিল প্রিয়তোষের। অনুরাধা প্রথম দিকে রাজী হন নি। প্রিয়তোষ মেয়েকে কী বুঝিয়েছিলেন তাঁর জানা নেই। বাপ আর মেয়ের ভেতর একটা অঘোষিত যুদ্ধ যে চলছে, চলছে প্রচন্ড টেনসান, সেটা নিউ আলিপুরে গেলে টের পাওয়া যেত। এই

সময়টা মল্লিনাথের ওপর আরো বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন অনুরাধা। আগে ছিলেন প্রচন্ড উদাসীন, আগ্রহশূন্য, এবার কিন্তু দেখা হলে তাঁর চোখে আগুন জ্বলে উঠত। মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে বেরুত কঠোরতা।

মাসখানেক স্নায়বিক যুদ্ধের পর এ বিয়েতে মত দিয়েছিলেন অনুরাধা। চন্দ্রাবতীর মতামতের প্রশ্নই ছিল না। পক্ষাঘাতে অসাড় মস্তিষ্ক নিয়ে কোনো কিছু বোঝার মতো অবস্থায় ছিলেন না তিনি। অবশ্য মেয়ের বিয়ের কথাটা তাঁকে জানানো হয়েছিল। চন্দ্রাবতী আচ্ছন্নের মতো শুধু তাকিয়ে থেকেছেন।

বিয়েটা আটকাবার জন্য হুমকি দিয়ে মল্লিনাথের কাছে বেনামা চিঠি এসেছিল। এটা যে অনুরাধার সেইসব মেরুদণ্ডহীন অ্যাডমায়ারারদের কাজ তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। মল্লিনাথ চিঠিগুলোকে কোনোরকম গুরুত্বই দেন নি, স্রেফ ছিঁড়ে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন।

মনে আছে, রীতিমত জাঁকজমক করেই তাঁদের বিয়েটা হয়েছিল। একমাত্র মেয়ে, তাই প্রচুর খরচ করেছিলেন প্রিয়তোষ। টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিগ বিজনেসম্যান, খবরের কাগজের লোকজন থেকে শুরু করে বিরাট বিরাট সরকারি অফিসার, কলকাতার বিখ্যাত অভিজাত পরিবারের সব মানুষ—সব মিলিয়ে হাজার পাঁচেক বিশিষ্ট অতিথি এ বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

বিয়ের পরদিন অনুরাধা আনুষ্ঠানিকভাবে মল্লিনাথদের যোধপুর পার্কের বাড়িতে এসেছিলেন। সেদিনের রাত্রিটা কালরাত্রি, বর কনের দেখা হওয়ার প্রশ্ন নেই। তার পরদিন ফুলশয্যা। সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথিরা বিদায় নিলে ফুলে ফুলে সাজানো একটি ঘরে অনুরাধাকে একান্তে পাওয়া গিয়েছিল।

অনুরাধা এমনিতেই অসাধারণ সুন্দরী। লাল টকটকে বেনারসী, হীরে এবং ফুলের সাজে তাঁকে অলৌকিক মোহময়ী মনে হয়েছিল। এই মেয়েটি তাকে মনে মনে অবজ্ঞা করত, কোনোদিন কোনো সম্মান তাঁকে দেয় নি তবু মল্লিনাথের কাছে কী যে অদম্য, তীব্র আকর্ষণ তার! সেই ফুলশয্যার রাতে

নববিবাহিতা স্ত্রীকে দেখতে দেখতে উদ্বেলিত হৃদয়ে তাঁর মনে হয়েছিল অনুরাধাকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যেত।

কাম্য নারীটিকে সম্পূর্ণ নিজেব করে পাওয়া গেছে। পুরনো উপেক্ষা আর মনে করে রাখেন নি মল্লিনাথ। আচ্ছন্নের মতো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অনুরাধা বলে উঠেছেন, 'তোমাকে দু-একটা কথা আমি আজই পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই। নিজেদের একজন এমপ্লয়ীকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার কখনও ছিল না, আমার মা সুস্থ থাকলে এ বিয়ে কিছুতেই হতে দিতেন না। বাবা তোমার মধ্যে কী দেখেছেন তিনিই জানেন। তাঁর হার্টের কন্ডিসান খুব খারাপ হয়ে গেছে, টেনসান হলে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে, তাই এ বিয়েতে রাজী হয়েছি। নিরুপায় হযেই তোমার পদবীটা আমার নামের সঙ্গে জুড়ে নিতে হল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। এ ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।'

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। স্ত্রীর দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, কী উত্তর দেবেন। জীবনে এমন অপমানিত, হতবাক এবং বিভ্রান্ত আর কখনও তিনি হন নি।

অনুরাধা এবার বলেছেন, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি খাটে শুচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করলে নিচে শুতে পার, নইলে অন্য কোনো ঘরে।' বলে খাটে উঠে পড়েছিলেন।

স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছেন মল্লিনাথ। অন্য ঘরে গেলে বাড়ির লোক এবং আত্মীয়স্বজনদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'ত। জীবনের সবচেয়ে রঙিন, সবচেয়ে মাদকতার রাতটিতে স্বপ্নভঙ্গ ঘটে গেছে। বাইরে ধীর লয়ে সানাই বেজে যাচ্ছিল। চারিদিকে ধবধবে তাজা ফুলের সুগন্ধ, বিছানায় দামী ফরেন সেন্টের সুবাস এবং সেই ঘরটিতে নীলাভ আলোর স্বপ্নময়তা। মল্লিনাথের মনে হচ্ছিল, সারা পৃথিবী যেন ঘন অন্ধকারে ডুবে গেছে। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, হাওয়া নেই। একটা বায়ুশূন্য সুড়ঙ্গের ভেতব তাঁকে যেন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে গেলে কেলেঙ্কারিটা জানাজানি হয়ে যাবে, তাই

ঘরেরই একধারে একটা সোফায় বসে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন মল্লিনাথ।

মাত্র দু'টি রাত শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়েছেন অনুরাধা। ফুল-শয্যার পরের দিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে তিনি নিউ আলিপুরে ফিরে যান। তারপর আর কোনোদিন যোধপুর পার্কে আসেন নি।

মল্লিনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর বিবাহিত জীবন একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আর কিছু করার নেই।

প্রিয়তোষ মেয়ের আচরণে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। মল্লি-নাথের দু হাত ধরে আন্তরিকভাবেই বলেছেন, 'আমি তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করে দিলাম। এটা আমি ভাবতে পারি নি।'

মল্লিনাথ তাঁকে কোনোরকম দোষারোপ করেন নি। শুধু বলেছেন, 'আপনি আর কী করবেন।'

এই নিয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ইন্ডাস্ট্রি আর বিজনেস সার্কেলে কিছুদিন গুঞ্জন শোনা গেছে। কিন্তু সেদিকে কান দেন নি মল্লিনাথ। 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর নানা কাজকর্ম ও তার ফিউচার এক্সপ্যানসান নিয়ে আরো মেতে উঠেছিলেন। মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছিলেন, অনুরাধাও তাঁর মায়ের 'হোম'-এর ব্যাপারে আরো বেশি করে জড়িয়ে গেছেন। নানা মীডিয়ায় আগে চন্দ্রাবতী মল্লিকের নাম বেশি করে দেখা বা শোনা যেত, এবার তার জায়গায় প্রচারের সব আলো গিয়ে পড়েছিল অনুরাধার ওপর—বিয়ের পর পদবী পালটে গিয়ে যাঁর নাম হয়েছে অনুরাধা চৌধুরী। আরো কিছু কিছু কথা কানে আসছিল। অনুরাধার পুরনো স্তাবকেরা আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে।

অনুরাধার সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সম্পর্কটা বিয়ের আগে যেমন ছিল প্রায় সেই রকমটাই হয়ে রইল। অনুরাধা তাঁর মা-বাবার কাছে নিউ আলিপুরেই থাকেন, মল্লিনাথ থাকেন তাঁদের যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে। আগের মতোই ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়। তখন সৌজন্যের খাতিরে দু-একটা কথা। ব্যস, এই পর্যন্ত। দু'জনের মধ্যে যে দূরত্বটা ছিল, এখনও সেটাই থেকে গেছে।

এইভাবে একটা বছর কেটে গেল। এর ভেতর প্রথমে মারা গেলেন চন্দ্রাবতী, তার কিছুদিন বাদে প্রিয়তোষ। মৃত্যুর আগে প্রিয়তোষ মল্লিনাথকে বলেছিলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

মল্লিনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন, কিছু বলেন নি।

প্রিয়তোষ এবার বলেছেন, 'আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আমার ইচ্ছে, তুমি এ বাড়িতে এসে থাকো। অনুরাধা এত বড বাড়িতে একা থাকবে, এটা ঠিক না। আমার কথাটা কি রাখবে বাবা?'

মল্লিনাথ একটু ভেবে জিজ্ঞেস করেছেন, 'এ ব্যাপারটা কি আপনার মেয়েকে জানিয়েছেন?'

প্রিয়তোষ বলেছেন, 'জানিয়েছি। তার আপত্তি নেই।'

যে অনুরাধা তাঁর স্বামীত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকাটা খুবই অসম্মানজনক। তবু প্রিয়তোষের মতো একটি মানুষ, মৃত্যু যাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আর দুঃখ দিতে চান নি মল্লিনাথ। বলেছেন, 'ঠিক আছে। আপনি যা চাইছেন তাই হবে।'

প্রিয়তোষ মারা যাবার পর মল্লিনাথ নিউ আলিপুরে স্থায়ীভাবে চলে এলেন। মনের কোনো অচেনা দুর্গম প্রান্তে সামান্য একটু দুরাশা কি তাঁর ছিল? যে দাম্পত্য জীবন শুরুতেই চুরমার হয়ে গেছে, নতুন করে সেটা জোড়া লাগার সম্ভাবনার কথা হয়ত তিনি ভেবে থাকবেন। হয়ত ভেবেছিলেন, কাছাকাছি থাকলে একদিন না একদিন অনুরাধা বদলে যেতে পারেন।

কিন্তু প্রিয়তোষের মনে যে সঙ্গোপন প্রত্যাশাই থাক, কিছুই ঘটল না। একই বাড়ির দুই প্রান্তে দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দার মতো তাঁরা দিন কাটাতে লাগলেন।

প্রিয়তোষের মধ্যে র‍্যাশানালিটি ছিল, মান-সম্মান বোধ ছিল কিন্তু তা ছাড়াও ছিল একটা রক্তমাংসের উত্তপ্ত দেহ। একেক দিন রাতে রক্তের ভেতর পৃথিবীর আদিম প্যাসান যখন জেগে উঠত, ভাবতেন, অনুরাধার ঘরের দরজা ভেঙে চুরমার করে তাঁর শরীরটাকে বর্বর যুগের কোনো পুরুষের মতো দখল করে নেবেন।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা এবং সুরুচি ভেতরকার দাহ অনেকখানি জুড়িয়ে দিত।

বহুদিন রাতে সিলিংয়ের দিকে পলকহীন তাকিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে মল্লিনাথের মনে হ'ত, অনুরাধার মধ্যে সেক্স বলে কি কিছুই নেই? সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ মস্তিষ্কে মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। এত তো অ্যাডামায়ারার অনুরাধার, তাঁকে ধোকার টাটির মতো খাড়া রেখে তাদের কারো সঙ্গে কি তাঁর বিবাহিত পত্নী অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক ঘটিয়ে ফেলেছেন? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠত মল্লিনাথের। প্রচন্ড জৈব ক্রোধে রক্তচাপ বেড়ে যেতে তাঁর, মনে হ'ত ছুটে গিয়ে অনুরাধার গলা টিপে খুন করে ফেলবেন।

আরো কয়েক বছর কেটে যায়। এর মধ্যে উল্কার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মল্লিনাথ। একের পর এক সিক ইন্ডাস্ট্রি দখল করে সেগুলোকে দারুণ লাভজনক কনসার্ন করে তো তুলছিলেনই, সেই সঙ্গে নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটও বসিয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলেই না, ইন্ডিয়ার অন্য সব স্টেটেও। 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর টার্ন ওভার, প্রফিট অবিশ্বাস্য অঙ্কে বেড়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে অন্যান্য অ্যাসেট আর গুড উইলও। স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে তাঁদের কোম্পানির শেয়ারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ে যাচ্ছিল। শেয়ার হোল্ডাররা অভাবনীয় ডিভিডেন্ড পেতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করার জন্য লোক মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাঁর বহু ইউনিট রেকর্ড পরিমাণ প্রোডাকশান করছিল। বিদেশে এক্সপোর্ট করে প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ উপার্জনের জন্য বছরের পর বছর নানা সরকারি অ্যাওয়ার্ড আর সার্টিফিকেট পেয়ে আসছিল।

বহুদিন পর একজন বাঙালি শিল্পপতি অর্থাৎ মল্লিনাথ সারা দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর বিজনেস ওয়ার্ল্ডকে চমকে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে প্রাচীন আর মর্যাদাসম্পন্ন চেম্বার অফ কমার্সে তাঁকে সম্মানজনক একটি পদও দেওয়া হয়েছিল।

ওদিকে মল্লিনাথের পাশাপাশি একজন সোসাল ওয়ার্কার হিসেবে অনুরাধার সুনাম শুধু পশ্চিমবঙ্গেই না, সারা ভারতে,

এমন কি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর কাজকর্ম শুধুমাত্র ফুটপাথের অনাথ ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা জায়গা থেকে অসহায়, ধর্ষিত, পরিত্যক্ত মেয়েদের জোগাড় করে কয়েকটা নারী কল্যাণ কেন্দ্রও খুলেছিলেন অনুরাধা। এরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে জন্য হাতের কাজ শেখার ট্রেনিংও দেওয়া হ'ত। শুধু তাই না, কুষ্ঠরোগিদের জন্য পুরুলিয়ায় একটা আরোগ্য কেন্দ্র বসানো হয়েছিল। অনুরাধার এই সব সোসাল ওয়ার্কে নানা জায়গা থেকে নিয়মিত গ্রান্ট আসতে শুরু করেছিল। ইওরোপ আমেরিকার বড় বড় ক'টা মিশনও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। এদের সাহায্যের পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছিল।

এ ধরনের সেবামূলক কাজের একটা তীব্র মোহ আছে। দিনের পর দিন তার মধ্যে বেশি করে জড়িয়ে যাচ্ছিলেন অনুরাধা। সুনাম, খ্যাতি এবং দেশ-বিদেশের নানা মীডিয়ার প্রচার তাঁর এমন একটা বিরাট ইমেজ তৈরি করে দিয়েছিল যাতে মনে হচ্ছিল তিনি যেন রক্তমাংসের মানুষী নন, স্বর্গের অলৌকিক কোনো দেবী। নিজের এই দেবীমহিমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন অনুরাধা। এটা যেন একটা আশ্চর্য কুহকময় ফাঁদ, এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা বা শক্তি কোনোটাই ছিল না তাঁর। নিজের বিশাল ইমেজকে আরো উজ্জ্বল, আরো মহিমান্বিত করে তোলার জন্য হোম, কুষ্ঠাশ্রম আর নারী কল্যাণ সমিতি নিয়ে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। এমনও হ'ত, দিনের পর দিন বাড়িতেই এলেন না। সপ্তাহখানেক বাদে ফিরে হয়ত পরদিনই আবার বেরিয়ে পড়লেন।

যে সব কাজে অনুরাধা হাত দিয়েছিলেন তার জন্য অজস্র টাকা দরকার। মৃত্যুর আগে প্রিয়তোষ এর জন্য 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস' থেকে বার্ষিক মোটা ডোনেসানের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে এত বড় বড় কাজ হয় না। তাই অন্য দিক থেকেও টাকার ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল অনুরাধাকে। ফি বছর স্টেট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বাজেটে সোসাল ওয়েলফেয়ার আর নারী-কল্যাণের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সেই সব ফান্ড থেকে

টাকা বার করতে প্রায়ই কলকাতা-দিল্লী করতে হ'ত অনুরাধাকে। তা ছাড়া বিদেশের নানা ট্রাস্ট এবং ফাউন্ডেসান এ ব্যাপারে দরজা খুলে রেখেছে, সে সব জায়গা থেকে ডোনেসান জোগাড় করতে বছরে দশ বারো বার আমেরিকা, কানাডা, ওয়েস্ট জার্মানি কি ফ্রান্স যেতেন।

দু'জনে যত ওপরে উঠছিলেন ততই তাঁদের ভেতরকার দূরত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সব মীডিয়া অনবরত জানিয়ে দিচ্ছিল এমন আইডিয়াল কাপল্ অর্থাৎ আদর্শ দম্পতি আর হয় না।

মীডিয়া যা-ই লিখুক বা বলুক, তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কেমন, মল্লিনাথের চাইতে কে আর ভাল জানত বা এখনও জানে! উঁচু বেদীর ওপর দেবীর মহিমায় যতই অনুরাধাকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল ততই হতাশ হয়ে পড়ছিলেন মল্লিনাথ। পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুদূর একটু সম্ভাবনাকে কখনও একেবারে বাতিল করে দেন নি তিনি। কিন্তু অনুরাধার ইমেজ তাঁকে বিভ্রান্ত করে ফেলছিল। না, আর কোনো আশা দেখতে পাচ্ছিলেন না মল্লিনাথ। যদিও প্রথম দিন থেকেই দূরে দূরে থেকেছেন অনুরাধা তবু তিনি দেবী হয়ে যাবেন, এটা ভাবা যায় নি।

এমন একজন দেবীকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য সবাই অভিনন্দন জানাত। কিন্তু দেবী নয়, একটি রক্তমাংসের নারীকে প্রয়োজন ছিল মল্লিনাথের। তাঁর চরিত্রে র‍্যাশানিলিটি, সংযম যেমন ছিল তেমনি যত দিন যাচ্ছিল, সে সব ছাপিয়ে রক্তের ভেতর অ্যানিম্যাল প্যাসান উদ্দাম হয়ে উঠছিল। দেবী নয়, তাঁর শরীরের দাহ জুড়িয়ে দিতে পারে এমন নারী তাঁর চাই। তাই অনিবার্য নিয়মে একদিন অবিনাশের আগমন ঘটল। মল্লিনাথের শারীরিক চাহিদাব দিকে লক্ষ রেখে সে গোপনে যোগান দিতে লাগল এমন একেকটি মেয়ে যাদের শরীর শুধুই সেক্সের বারুদে ঠাসা।

কতক্ষণ খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন, খেয়াল নেই মল্লিনাথের আর কখন বম্বে মেল রায়পুরে এসে থেমেছে টের পান নি। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তে চমকে ওঠেন।

নিশ্চয়ই অবিনাশ। প্রতিটি স্টেশনেই গাড়ি থামলেই সে এসে খবর নিয়ে যায়, কোনো প্রয়োজন আছে কিনা।

মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কে. অবিনাশ?'

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। বাইরে থেকে অবিনাশেরই গলা ভেসে আসে, 'হ্যাঁ, স্যর।'

'এখন কিছু দরকার নেই। তুমি পরে দেখা ক'রো।'

'আচ্ছা স্যর।' অবিনাশ চলে যায়। মিনিট দুই বাদে ফের দরজায় খুট খুট আওয়াজ। এবার বিরক্ত হন মল্লিনাথ। গলা সামান্য তুলে বলেন, 'কী আশ্চর্য, একটু আগে কী বললাম?'

পরক্ষণে দরজার ওধার থেকে যে কন্ঠস্বরটি শোনা যায় তা অবিনাশের নয় সুকুমারের। নিজের নাম জানিয়ে সে বলে, 'দরজা খুলুন স্যর।'

এখন কারো সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না মল্লিনাথের। তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ বোধ করছি। কাইন্ডলি পরে আসবেন।'

'অসুস্থ? সীরিয়াস কিছু নাকি?' সুকুমারের গলায় উদ্বেগ ফুটে বেরোয়।

মল্লিনাথ বুঝতে পারেন অসুস্থতার কথাটা বলে ফেলা ঠিক হয় নি। এখন হাজার রকমের জেরা চালাবে সুকুমার। তা ছাড়া পরোপকারের বাসনাটা বেশি চাগাড় দিয়ে উঠলে ডাক্তার টাক্তারের জন্য হইচই বাধিয়ে দিতে পারে সে। মল্লিনাথ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন, এর ফলে তিনি যে এই ট্রেনে বম্বে যাচ্ছেন সেটা আর গোপন থাকবে না। অনেকেই দৌড়ে এসে ভিড় জমাবে। কে বলতে পারে, এভাবে মণিকার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে না? কাজেই শুরুতেই সুকুমারকে থামানো দরকার। ব্যস্তভাবে তিনি বলেন, 'না না, তেমন কিছু নয। মাথাটা একটু ধরেছে। খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা স্যর, আমি তা হলে এখন যাই। ভিলাইতে কি আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

ভিলাইতে ট্রেনটা থামবে দুপুর পার করে। লাঞ্চ খেয়ে তখন মল্লিলাথ ঘুমোবার চেষ্টা করবেন। অসুখ বিসুখ না হলে দিনে

ঘুমনোর অভ্যাস তাঁর কোনোকালেই নেই। যাঁর প্রতিটি দিন অগুনতি কর্মসুচিতে ঠাসা তাঁর পক্ষে অলস দিবানিদ্রায় সময় নষ্ট করা অসম্ভব। আসলে নাছোড়বান্দা সুকুমারকে যতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। মল্লিনাথ বলেন, 'আপনি বরং নাগপুরে আসুন।' নাগপুরে বম্বে মেল থামবে বিকেল নাগাদ।

সুকুমার বলে, 'ঠিক আছে স্যর, তখনই আসব। ও, আসল ব্যাপারটাই ভুলে গেছি। আপনাকে প্রথমেই অভিনন্দন জানানো উচিত ছিল। কনগ্রাচুলেসনস স্যর—'

বেশ অবাক হয়েই মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের জন্যে কনগ্রাচুলেসন?'

রীতিমত উত্তেজিত স্বরে সুকুমার বলে, 'লোকাল নিউজ পেপারে পড়লাম মিসেস চৌধুরী মানে আপনাও স্ত্রী ম্যাগসেসে প্রাইজ পেয়েছেন। দ্যাখেননি?'

'দেখে নেবো।' মিথ্যেই বলেন মল্লিনাথ।

'আমি কি একটা কপি দিয়ে যাবো?'

'ব্যস্ত হবেন না। আমি জোগাড় করে নেবো।'

'তা হলে এখন চলি স্যর—'

কোলের ওপর 'বিদর্ভ টাইমস'টা পড়ে আছে। আরেক বার মল্লিনাথ অনুরাধার ছবিটার দিকে তাকান। ভাবেন, বম্বে পৌঁছে স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলেক্স করলে কেমন হয়?

চার

সুকুমার যে একজন অতীব একগুঁয়ে টাইপের তুখোড় জার্নালিস্ট সেটা ট্রেনে করে বম্বে না গেলে জানতে পারতেন না মল্লিনাথ। কথামতো নাগপুরে এসে সে ঠিক হাজির হয়ে গিয়েছিল। তখন তাকে ফেরাবার মতো অছিলা হাতের কাছে পাওয়া যায় নি।

নাগপুরে সেই যে সুকুমার তাঁর কুপেতে ঢুকেছিল, তারপর রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেছে। একটা টেপ রেকর্ডার সঙ্গেই ছিল তার। সেটা চালিয়ে দিয়ে পশ্চিম বাংলার

শিল্পের ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া, তার হাজার সমস্যা এবং পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য প্রশ্ন করে গেছে সে। উত্তর দিতে দিতে মুখে ফেনা উঠেছে মল্লিনাথের। তবু ইন্টারভিউটা শেষ হয় নি।

সাড়ে আটটায় প্রায় হাতজোড় করে মল্লিনাথ বলেছিলেন, 'ভীষণ টায়ার্ড ফীল করছি। ইন্টারভিউর বাকিটা পরে হবে।'

সুকুমার বলেছে, 'বম্বেতে দয়া করে আমাকে আরেকটু সময় দেবেন। তা হলেই কাজটা কমপ্লীট হয়ে যাবে।'

মল্লিনাথ বলেছেন, 'বম্বেতে আমার প্রচুর কাজ। তার ভেতর থেকে কি সময় বার করা যাবে?'

'স্যর, আর মাত্র তিরিশ চল্লিশটা মিনিট আপনার কাছে চাইছি। আই উড রিমেন এভার গ্রেটফুল টু ইউ।'

'দেখি কী করা যায়—'—মল্লিনাথ বলেছেন বটে, কিন্তু মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছেন বম্বেতে সুকুমারের সঙ্গে দেখা করবেন না। ওর জন্য ট্রেনের এই লম্বা সফরটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। বম্বেতে যে ক'দিন থাকবেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মণিকার সঙ্গে সময় কাটাবেন। এর ভেতর একজন সাংবাদিক যদি ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে সেটা খুবই অস্বস্তি আর ঝুঁকির ব্যাপার। তবে এটাও ঠিক, সুকুমার তাঁকে সহজে ছাড়বে না। তাকে কিভাবে এড়ানো যায়, সেটা পরে ভেবে ঠিক করতে হবে।

যতক্ষণ সুকুমার কুপেতে ছিল অবিনাশ ত্রিসীমানায় ঘেঁষে নি। নিশ্চয়ই দূর থেকে দেখে ফিরে গেছে।

সুকুমার নেমে যাবার মিনিট কুড়ি বাদে ট্রেন যখন পরের স্টেশনে থামে সেই সময় আবার অবিনাশকে দেখা যায়। সে মল্লিনাথকে রাতের ওষুধ এবং ডিনার খাইয়ে দশটা নাগাদ একটা স্টেশনে নেমে তার কম্পার্টমেন্টে চলে গিয়েছিল। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন মল্লিনাথ। কিন্তু প্রথম দিকে ভাল ঘুম হয় নি। অনুরাধা, মণিকা এবং তাঁর এবারের বম্বের কর্মসূচির ব্যাপারে কিছু এলোমেলো চিন্তা তাঁকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রাখে। তারপর কখন গাঢ় ঘুমে ডুবে গিয়েছিলেন, মনে নেই।

বম্বে মেল আজ এক মিনিটও লেট করে নি। নির্দিষ্ট সময়েই সেটা ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে পেঁছে যায়। আরব সাগরের এ প্রান্তের এই শহরে এখনও ভাল করে সকাল হয় নি।

অবিনাশকে কাল রাতেই মল্লিনাথ বলে দিয়েছিলেন আজ ভি. টি অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে সে যেন তাঁর কাছে না আসে, মণিকাকে নিয়ে সোজা গেস্ট হাউসে চলে যায়। 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর বম্বে অফিসের জেনারেল ম্যানেজার মহাদেব কেলকার স্টেশনে মল্লিনাথকে রিসিভ করতে আসবেন। তিনিই তাঁকে হোটেলে পেঁছে দেবেন।

কেলকার তো থাকবেনই। তা ছাড়া ট্রেন থেকে এক গাদা জার্নালিস্ট আর স্টক ব্রোকার-কামশ্চলফার রাজিন্দর বাজপেয়ী নামবেন। এত চেনা লোকের মধ্যে অবিনাশ মণিকাকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে আসে, এটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ট্রেন থেকে প্যাসেঞ্জাররা নামতে শুরু করেছিল। মল্লিনাথ কিন্তু নামেন নি, কুপে'তে বসেই কাচের জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই ভিড়ের ভেতর মহাদেব কেলকারকে দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে সাদা ধবধবে উর্দি-পরা দু'টি বেয়ারা। এরা 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এরই এমপ্লয়ী।

সুপুরুষ কেলকারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লন্ডনের চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, তা ছাড়া বিজনেস ম্যানেজমেন্টেও বিদেশের ডিগ্রি আছে। বৃটিশ উচ্চারণে চোস্ত ইংরেজি বলেন। চলনে-বলনে-পোশাকে প্াক্কা সাহেব। দুর্দান্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কেলকার। এঁর হাতে বম্বে অফিসের দায়িত্ব দিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত মল্লিনাথ।

কেলকারও মল্লিনাথকে দেখতে পেয়েছিলেন। বেয়ারাদের নিয়ে দ্রুত কুপে'তে উঠে আসেন। বলেন, 'গুড মর্নিং স্যর।'

'গুড মর্নিং।' মল্লিনাথ মৃদু হাসেন।

'আশা করি, রেল ভ্রমণটা ভালই উপভোগ করেছেন।'

উপভোগটা যে কেমন করেছেন' তা তো আর কেলকারকে বলা যায় না।

'ওই একরকম—' বলে আস্তে মাথা নাড়েন মল্লিনাথ।

বেয়ারা দুটোকে কিছুই বলতে হয় না, তারা ক্ষিপ্র হাতে মল্লিনাথের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুপে থেকে বেরিয়ে যায়।

কেলকার এবার বলেন, 'আসুন স্যর—'

প্ল্যাটফর্মে নামতেই দেখা যায় রাজিন্দর বাজপেয়ী একটি দুর্ধর্ষ চেহারার মেয়েকে নিয়ে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। হয়ত কেউ তাঁদের নিতে আসবে, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। মেয়েটা মিসেস বাজপেয়ী নয়, মল্লিনাথ তা জানেন। মিসেস বাজপেয়ী অর্থাৎ শোভনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।

চোখাচোখি হতেই 'হ্যাল্লো—' বলে একটা উল্লসিত চিৎকার ছেড়ে মল্লিনাথের দিকে দৌড় লাগাতে যাচ্ছিলেন রাজিন্দর, তার আগেই মল্লিনাথ কেলকারকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে যান, কেননা রাজিন্দরের মুখ এমনই আলগা যে হুট করে তাঁরই ম্যানেজারের সামনে এমন কিছু বলে বসবেন যাতে লজ্জায় মাথা তোলা যাবে না।

রাজিন্দার বলেন, 'আরে ভাই, তুমিও এই ট্রেনেই এলে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'একলা?'

'রাইট।'

চোখের কোণ দিয়ে সঙ্গিনীকে দেখিয়ে গলা নামিয়ে রাজিন্দর বলেন, 'ট্রেনেই যখন এলে, এরকম একটি সেক্স-বম্ব জুটিয়ে আনলেই পারতে। বত্রিশটা ঘন্টা দারুণ কেটে যেত।'

রাজিন্দর প্রচন্ড বেপরোয়া। লোকলজ্জা টজ্জার পরোয়া করেন না। যা করেন, গলা ফাটিয়ে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেন। তাঁর মধ্যে ঢাক ঢাক গুড়গুড় বা মিনমিনে ব্যাপার স্যাপার নেই। বেশির ভাগ লোক চুরি করে মজা লোটে। সেদিক থেকে রাজিন্দরের ধাত একেবারে আলাদা। এই জন্য এই দু কান কাটা লোকটাকে ভালও লাগে মল্লিনাথের। তিনিও যে একটি যুবতীকে এই ট্রেনেই নিয়ে এসেছেন, অথচ মধ্যবিত্ত ভীরুতার কারণে তাকে চোখেও দেখতে পান নি, ফলে গোটা রেল ভ্রমণটা পুরোপুরি

আলুনি হয়ে গেছে, সেটা আর মুখ ফুটে বলা যায় না। মল্লিনাথের মুখে ফিকে একটু হাসি ফোটে শুধু।

রাজিন্দর ফের গলা তুলে তাঁর সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন, 'নাউ মীট মাই গার্ল ফ্রেন্ড লিসি। আর লিসি, এ হল ভেরি বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মল্লিনাথ চৌধুরী—অতীব সচ্চরিত্র ব্রহ্মচারী টাইপের মানুষ। তোমার তো অনেক দারুণ দারুণ বান্ধবী আছে! তাদের কাউকে মল্লিনাথের পেছনে লাগিয়ে ওর চরিত্রটি নষ্ট করতে পার?'

লিসি হাসতে থাকে। আর মল্লিনাথের কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। তিনি বলেন, 'আচ্ছা ভাই, এখন চলি। পরে দেখা হবে।'

'আরে ব্রাদার, অত তাড়া কিসের। পুরুষ মানুষ, টাকার পাহাড়ের মাথায় বসে আছ। জীবনটাকে থোড়াকুছ এনজয় করো। লিসির সঙ্গে কথা পাক্কা করে নাও। ওর এক বান্ধবীকে........'

আর কিছুক্ষণ থাকলে রাজিন্দর বিপজ্জনক কান্ড ঘটিয়ে বসবেন। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে মল্লিনাথ বলেন, 'আমার জন্যে লোক দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা—' বলে পেছন ফেরেন।

রাজিন্দর গলা সামান্য চড়িয়ে বলেন, ও. কে, বস্। তবে একটি কথা মনে রেখো, এই লিসির মতো একটি গার্লফ্রেন্ড জোটাও। বয়েস হচ্ছে তো, টনিকের কাজ দেবে। আয়ু মিনিমাম দশ বছর বেড়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর কেলকারের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসতেই চোখে পড়ে সুকুমার এবং অন্য জার্নালিস্টরা ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কখন বেরিয়ে এসেছিল, মল্লিনাথ জানেন না। এই সাংবাদিকদের অনেকেই তাঁর চেনা। ইন্টারভিউ বা 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর নানা খবর নিতে মাঝে মাঝে তাঁদের অফিসে বা বাড়িতে এসেছে, কখনও বা ফোন করেছে।

সুকুমার যে তার সাংবাদিক বন্ধুদের তাঁর আসার খবরটা দেয় নি, এতে খানিকটা আরাম বোধ করেন মল্লিনাথ। দিলে এমন নির্বিঘ্নে স্টেশনের বাইরে আসা যেত না, ওরা তাঁর জীবন এতক্ষণে অতিষ্ঠ করে ফেলত।

সাংবাদিকরা যাতে দেখতে না পায়, সে জন্য কেলকারের গা ঘেঁষে তাঁর আড়ালে আড়ালে চলেছেন মল্লিনাথ। প্রাইভেট কারের পার্কিং জোনটা একটা বড় চত্বর পেরিয়ে ডান দিকে।

ট্যাক্সি ছাড়া সাংবাদিকদের আপাতত আর কোনোদিকে নজর নেই। কিন্তু একজনকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি। সে পাক্ষিক 'দিনকাল'-এর তরুণ দত্ত। তরুণ পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওদিকে চত্বরটা পেরিয়ে পার্কিং এরিয়ার দিকে যেতে যেতে মল্লিনাথ হঠাৎ দেখতে পান, বাঁ পাশে কোনাকুনি দাঁড়িয়ে আছে অবিনাশ। তার পাশে একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের তরুণী। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় তাঁর হাইট বেশ ভাল। পাঁচ ফিট ছয় কি সাত ইঞ্চি হবে। সিল্কের মতো নরম ঘন চুল হেয়ার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। গায়ের রং পাকা গমের মতো। সরু কোমর, ডিম্বাকৃতি ভরাট মুখ, মসৃণ উজ্জ্বল ত্বক। কাঁধ থেকে নিটোল হাত নেমে এসেছে। পাতলা নাক, ঈষৎ পুরু রক্তাভ ঠোঁট। বড় বড় টানা চোখে ঢুলু ঢুলু মাদকতা যেন মেশানো। পরনের দামী শিফন, স্লিভলেস ব্লাউজ, মাঝারি হিলের জুতো, আঙুলে সাদা ধবধবে পাথর বসানো আংটি, গলায় সরু সোনার চেনে আটকানো মাছের আকারের মীনে-করা লকেট—সব মিলিয়ে মেয়েটির মধ্যে দুর্দান্ত এক ম্যাজিক রয়েছে। নাঃ, অবিনাশের পছন্দ আছে। এর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে অনেক দেখেছেন মল্লিনাথ। কিন্তু এমনটি আগে আর চোখে পড়ে নি। মেয়েটার সারা গায়ে অদৃশ্য এক চুম্বক আটকানো রয়েছে যেন। নিজের অজান্তেই ওদের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

চমকে উঠে ওদিক থেকে হাতটা সামান্য তুলে ইশারায় বারণ করে দেয় অবিনাশ। সঙ্গে সঙ্গে মল্লিনাথের খেয়াল হয়, এই প্রকাশ্য দিবালোকে ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের এই চত্বরে একদিকে যেখানে তিরিশ-চল্লিশটি ধুরন্ধর জার্নালিস্ট রয়েছে, আরেক দিকে রয়েছেন তাঁর নিজেরই একজন ম্যানেজার তখন এভাবে মণিকার দিকে যাওয়াটা মারাত্মক হঠকারিতা। শঙ্কিত ভঙ্গিতে এধারে ওধারে তাকাতে থাকেন তিনি। তাঁর ভয়, এই অবস্থায় তাঁকে

কেউ দেখে ফেলল কিনা !

কিন্তু এই বিশাল স্টেশনে এখন হাজার দুই আড়াইয়ের মতো মানুষ। বিপুল জনতার ভেতর থেকে কেউ যদি তাঁর ওপর নজর রাখে সেটা জানা মল্লিনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। এতগুলো মানুষের মুখ আলাদা আলাদা ভাবে খুঁটিয়ে দেখা অভাবনীয় ব্যাপার। তাই তিনি জানতেও পারলেন না সেই সাংবাদিকটি অর্থাৎ তরুণ দত্ত মণিকাকে দেখার পর থেকে তাঁর প্রতিটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে চলেছে।

কেলকার খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'স্যর, দাঁড়িয়ে গেলেন ?'

মল্লিনাথ হকচকিয়ে যান। দ্রুত কেলকারের কাছে এগিয়ে এসে এলোমেলোভাবে বলেন, 'ওধারে একটি লোককে চেনা মনে হয়েছিল। তারপর দেখলাম ভুল হয়েছে। চলুন—'

কেলকার আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

একটু পর দু'জন পার্কিং জোনে চলে আসেন। একধারে একটা এয়ারকন্ডিশানড ফরেন মার্সেডিজ দাঁড়িয়ে ছিল। এটা 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর গাড়ি, ভি. আই. পি'দের জন্য কেনা হয়েছে। মল্লিনাথকে নিয়ে কেলকার গাড়িটায় ওঠেন।

ধবধবে উর্দি-পরা শোফার শিরদাঁড়া টান টান করে স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল। মল্লিনাথরা উঠে বসতেই সে স্টার্ট দেয়।

কেলকার শোফারকে বলেন 'হোটেল স্কাইলাইন ইন্টার-ন্যাশনাল'-এ চল। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছ।'

মল্লিনাথ বলেন, 'ওখানেই এবার বুঝি আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ স্যর।'

আর কিছু না বলে নীলাভ কাচের জানালার বাইরে তাকান মল্লিনাথ। অবিনাশ আর মণিকা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব মণিকাকে জুহুর গেস্ট হাউসে নিয়ে যাবার জন্য প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা করেছে অবিনাশ। সেটা এখনও এসে পৌঁছয় নি, তাই অপেক্ষা করছে ওরা।

অবিনাশদের পাশ দিয়ে যাবার সময় অদম্য আকর্ষণে জানালার

দিকে একবার ঝুঁকে মণিকাকে দেখতে থাকেন মল্লিনাথ।

একসময় গাড়িটা স্টেশনের বাইরে এসে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার দিকে ছুটতে থাকে। দু'ধারে বম্বে মেট্রোপলিসের গমগমে চেহারা। বিরাট বিরাট সব অফিস বিল্ডিং। ফাঁকে ফাঁকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, শপিং আর্কেড, দারুণ দারুণ সব শো-রুম।

চার লেনের ঝকঝকে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ির অন্তহীন স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কত যে ট্যাক্সি, ভ্যান, নানা মডেলের দেশী এবং বিদেশী কার, তার হিসেব নেই। বম্বে কেন যে ইন্ডিয়ার কমার্সিয়াল ক্যাপিটাল, সেটা এখানকার রাস্তায় নামলেই টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ পাশ থেকে কেলকার ডাকেন, 'স্যর—'

অন্যমনস্কর মতো বাইরে তাকিয়ে ছিলেন মল্লিনাথ। আকাশ-ছোঁয়া হাইরাইজ শো-উইন্ডো বা গাড়িটাড়ি—কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখের সামনে কোনো অদৃশ্য টিভি স্ক্রিনে মণিকার ছবিটাই বার বার ভেসে উঠছিল। কেলকারের ডাক কানে যেতে চমকে মুখ ফেরান মল্লিনাথ, 'কিছু বলছিলেন কেলকার-সাহেব?'

তাঁর চমকে ওঠাটা লক্ষ করেছিলেন কেলকার। আগে বহুবার বম্বে এসেছেন মল্লিনাথ। অবশ্য ট্রেনে নয়—প্লেনে। প্রতি বারই তাঁকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে গেছেন কেলকার। অসম্ভব কাজের মানুষ। রোবোটের মতো খাটতে পারেন, কম্পিউটরের মতো দক্ষতা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কোম্পানির গেস্ট হাউস বা হোটেলের দিকে যেতে যেতে এখানকার অফিস এবং প্রোডাকসান ইউনিটগুলোর খোঁজখবর নিতে শুরু করতেন। কিন্তু এবার কেমন যেন চুপচাপ আর দূরমনস্ক। বম্বের একটা বিশাল কোম্পানির সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার প্রোজেক্ট ফাইনাল করতে এসেছেন, অথচ সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নি। সমস্ত ব্যাপারটা বিস্ময়কর এবং অস্বাভাবিক।

কেলকার জিজ্ঞেস করেন, 'স্যর, আপনার শরীর কি ভাল নেই?'

ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যান মল্লিনাথ। কেলকার কি কিছু

লক্ষ করেছেন? অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সোফিস্টিকেটেড এই মানুষটিকে দেখে তা অবশ্য বোঝার উপায় নেই। একটু ব্যস্ত-ভাবেই বলেন, 'না না, আই অ্যাম পারফেক্টলি অল রাইট।'

মল্লিনাথের শরীরিক সুস্থতা সম্পর্কে আর কোনো কৌতূহল দেখান না কেলকার। ধীরে ধীরে বলেন, 'স্যর, আজ দুটোর সময় 'ডোনা ইন্টারন্যাশনাল'-এর পারেখ সাহেবের সঙ্গে আপনার মিটিং আছে। ওঁর সঙ্গে ওঁদের কোম্পানির কয়েক জন আসবেন। আপনার সঙ্গে মালিকানিসাহেব আর আমি থাকব।' মালকানি 'জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস'-এর বম্বে ইউনিটের ফিনান্স কন্ট্রোলার।

তাঁর অন্যমনস্কতা লক্ষ করেই কি মিটিং-এর সময় এবং উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দিলেন কেলকার? মল্লিনাথ একটু হাসেন। বলেন, 'কিছুই ভুলিনি কেলকারসাহেব। আমার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে অবিচার করবেন না।'

কেলকার আদৌ বিব্রত হন কিনা জানা যায় না। তিনি বলেন, 'স্কাইলাইনে বড় বড় কোম্পানির মিটিং-এর জন্যে চার-পাঁচটা কনফারেন্স রুম রয়েছে। আমরা একটা 'বুক' করেছি।'

'ঠিক আছে।'

এরপর বম্বে অফিসের কাজকর্ম এবং নাসিকে আর অম্বরনাথে তাঁদের যে ফ্যাক্টরি আছে, সে সব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে মল্লিনাথ জানতে পারেন, সমস্ত কিছু মসৃণ নিয়মে চলছে।

একসময় মার্সেডিজ হোটেলে পৌঁছে যায়।

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার উল্টোদিকে সমুদ্রের গা ঘেঁষে হোটেল 'স্কাইলাইন ইন্টারন্যাশনাল'-এর ছাব্বিশ তলা বিশাল বাড়ি। তারই এগার তলায় প্রকান্ড স্যুইটে মল্লিনাথকে নিয়ে আসেন কেলকার। সেই বেয়ারা দুটো আগেই স্টেশন থেকে তাঁর মালপত্র এনে গুছিয়ে রেখেছে। হোটেলের লোকজন তো আছেই, যে ক'দিন মল্লিনাথ এখানে থাকবেন, ওরা এখানে থেকে তাঁর আরাম এবং স্বাচ্ছন্দের দিকটা দেখবে। প্রতি বারই তিনি বম্বে এলে এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

কেলকার বলেন, 'স্যুইটটা আপনার পছন্দ হয়েছে?'

মল্লিনাথ বলেন, 'হ্যাঁ, ফাইন।'

এরপর কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে টয়লেটে চলে যান তিনি। আধঘন্টা বাদে শেভ-টেভ করে, পোশাক বদলে বেরিয়ে আসতেই কেলকার ফোনে রুম সারভিসকে ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিতে বলেন। তিনি সকালে কী খান, দুপুরে এবং রাত্তিরে কী ধরনের লাঞ্চ আর ডিনার করেন, সব কেলকারের মুখস্ত।

মল্লিনাথের অনুরোধে কেলকার তাঁর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেন। তারপর একটা ছোট টেবলের ওপর মর্নিং এডিসানের সবগুলো ইংরেজি কাগজ দেখিয়ে বলেন, 'আমি এবার যাব স্যর। দু'রাত ট্রেনে নিশ্চয়ই ভাল ঘুম হয়নি। কাগজগুলো দেখতে দেখতে একটু রেস্ট নিন। রুম সারভিসকে বলা আছে, বারোটায় লাঞ্চ দেবে আর একটা নাগাদ ক্যালকাটা আর দিল্লীর কাগজগুলো পাঠিয়ে দেবে। আমি দেড়টায় আসব।'

'আচ্ছা—'

কেলকার চলে যান। মল্লিনাথের সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। একটা বেয়ারাকে ডেকে বড় বেড রুমটায় খবরের কাগজগুলো রেখে আসতে বলেন। হুকুম তৎক্ষণাৎ তামিল করা হয়। মল্লিনাথ সেখানে গিয়ে বিছানায় শুয়ে আজকের 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-খানা তুলে নিয়ে হেডলাইনগুলোর ওপর চোখ বুলোতে থাকেন। দুটো রাত এবং একটা গোটা দিন দারুণ টেনসানে কেটেছে। ভাল করে ঘুমোতে পারেননি। ক্রমশ তাঁর দু'চোখ জুড়ে আসতে থাকে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। ঘুমের চটকা ভেঙে যায়। চল্লিশ মিনিটও পার হয় নি, মল্লিনাথ এই হোটেলে এসেছেন। কেলকার ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভবই নয় তিনি এখানে আছেন। তা হলে কে ফোন করতে পারে? কেলকারই কী? এখান থেকে থেকে চলে যাবার পর হয়ত জরুরি কিছু মনে পড়ে থাকবে তাঁর। ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই লাইনের ওধার থেকে টেলিফোন অপারেটর মেয়েটির সুরেলা কন্ঠস্বর ভেসে আসে, 'স্যর, অবিনাশ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। তাঁকে কী বলব?'

প্রথমটা অবাক হয়ে যান মল্লিনাথ। অবিনাশরা কি জুহুতে না গিয়ে তাঁর পেছন পেছন এই হোটেলে এসে হাজির হয়েছে? অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তিনি বলেন, 'আমাকে লাইনটা দিন।'

একটু পরেই অবিনাশের গলা ভেসে আসে, 'হ্যালো, স্যর—'

'কোত্থেকে ফোন করছ?'

'জুহুর গেস্ট হাউস থেকে।'

বিমূঢ়ের মতো মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যে হোটেল স্কাইলাইনে উঠেছি, তুমি জানলে কী করে?'

অবিনাশ খুবই বিনীতভাবে বলে, 'আপনি হোটেলে উঠবেন, সেটা তো বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা বলেছি।'

'তা হলে আর খুঁজে বার করাটা এমন কি কঠিন ব্যাপার?'

মল্লিনাথের বিস্ময় বাড়ছিলই। তিনি বলেন, 'তোমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেল নাকি হে? কে কোথায় গেল না গেল, পঁচিশ মাইল দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছ!'

কন্ঠস্বরে আরেকটু বিনয় ঢেলে অবিনাশ বলে, 'না স্যর, আমি আমার কমনসেন্সটা শুধু অ্যাপ্লাই করেছি।'

'কি রকম?'

'আপনার মতো এত বড় মানুষ তো আর থার্ড ক্লাস রদ্দি হোটেলে উঠবেন না। তাই জুহুতে এসেই বম্বের ফাইভ-স্টার হোটেলগুলোতে ডায়াল করতে লাগলাম। পাঁচতারা মার্কা ক'টা আর হোটেল আছে এ শহরে? ম্যাক্সিমাম দশ বারোটা। প্রথম চারটেতে ফেল করলাম। ফিফথ অ্যাটেম্পট স্কাইলাইনে, অ্যান্ড আই অ্যাম সাকসেসফুল।'

সেই প্রফেসানাল দক্ষতা। অবিনাশ দত্ত নামের এই লোকটা পেটের জন্য জঘন্য দালালি করে জীবনটা বাজে খরচ করে দিচ্ছে। নইলে ওর মধ্যে যা জিনিস আছে তাতে ফরেন সারভিস থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির টপ ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় ঢুকতে পারলে চড় চড় করে অনেক ওপরে উঠে যেত।

যাই হোক, অবিনাশকে নিয়ে মল্লিনাথের বিস্ময় বেশিক্ষণ

স্থায়ী হয় না। একটু পরেই চোখের সামনে দুর্দান্ত শরীরওলা মণিকা ভেসে ওঠে।

মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'ওদিকের খবর কী? সব ঠিক আছে?'

তিনি কোন খবর জানাতে চাইছেন, পলকে বুঝে ফেলে অবিনাশ। বলে, 'আছে স্যর। মণিকাকে তার স্যুইটে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি। সে আমার সামনেই বসে আছে। আপনি কি ওর সঙ্গে কথা বলবেন?'

একটু চুপ করে থাকেন মল্লিনাথ। জীবনে নারীসঙ্গ তিনি কম করেন নি। আর মণিকা এমন কিছু দুর্লভ মেয়েমানুষ নয়, মোটা টাকার মজুরি নিয়েই এসেছে সে। তবু তাকে দেখার পর থেকে মনে হয়েছে ও আলাদা, এমন মেয়ে আগে অন্তত দেখেন নি। হৃৎপিন্ডের ভেতর দিয়ে তিরতিরে স্রোতের মতো কিছু একটা বয়ে যায় তাঁর। নিচু গলায় বলেন, 'আচ্ছা, লাইনটা দাও ওকে।'

কয়েক সেকেন্ড পর মণিকার গলা ভেসে আসে, 'নমস্কার। ভেবেছিলাম, পরশু আপনার সঙ্গে আলাপ হবে, হল না। ব্যাড লাক আমার।'

মেয়েটির গলা মিষ্টি কিন্তু সামান্য ভারী আর দানাওলা। যাকে ইংবেজিতে হাস্কি বলে, অনেকটা সেইরকম। তার সঙ্গে এক ধবনের চাপা যৌন-আবেদন যেন মেশানো। কথা শুনে মনে হয়, মণিকা বেশ শিক্ষিত। এত বড় একজন টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সঙ্গে প্রথম আলাপ করছে কিন্তু বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই।

মল্লিনাথ বলেন, 'ব্যাড লাক তো আমারও। দু'দিনের ট্রেন জার্নিটা একেবারেই এনজয় করা গেল না।'

'ট্রেনে অতগুলো জার্নালিস্ট ছিলেন, তা ছাড়া আপনার এক বন্ধুও। এঁদের জন্যেই—তাই না?'

'হ্যাঁ।'

গলার স্বর ঝপ করে অনেকটা নামিয়ে দেয় মণিকা, 'ধরা পড়লে দুর্নামের ভয় তো থাকেই।'

ভীষণ হকচকিয়ে যান মল্লিনাথ। বলে, 'না, মানে—'

'বিখ্যাত লোকেদের অনেক হিসেব করে এদিকে ওদিকে পা ফেলতে হয়—কী বলেন ?' বলে পিয়ানোর বাজনার মতো ঢেউ তুলে তুলে হাসতে থাকে মণিকা।

শুধু মারাত্মক চেহারাই না, কথাবার্তাতেও দারুণ স্মার্ট মেয়েটা। সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেও বেশ ভাল লাগছিল মল্লিনাথের। বুঝতে পারছিলেন মণিকা মজাই করছে। তিনি কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মণিকা ফের বলে ওঠে, 'অবিনাশবাবু বলছিলেন, দুপুরে আপনার কী কনফারেন্স আছে। কখন শেষ হচ্ছে ?'

'মনে হচ্ছে, চারটে-টারটে বেজে যাবে।'

'তারপর ?'

'একবার আমাদের অফিসে যাব। সেখানে কিছু কাজ আছে।'

'কিভাবে, কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?'

মল্লিনাথ বলেন, 'সন্ধের পর আমি গেস্ট হাউসে যাচ্ছি।'

গাঢ় গলায় মণিকা বলে, 'আমি আপনাকে ভীষণ এক্সপেক্ট করছি। যত তাড়াতাড়ি পারেন, চলে আসবেন। প্লিজ—'শেষ শব্দটিতে দীর্ঘ টান দিয়ে থামে সে।

এই জাতীয় মেয়েরা হাজার রকমের ছলাকলায় তুখোড় হয়ে থাকে। যে ক্লায়েন্টের পয়সা নিয়ে মজুরি খাটতে আসে তাকে বোঝাতে চায়, তুমি ছাড়া জগতে আমি আর কিছু জানি না। তুমিই আমার সর্বস্ব। কিন্তু সবটাই যে মেকি, প্রফেসানের ঠাট বজায় রাখতে নকল ভালবাসার ভান, তা ধরে ফেলতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মণিকার বলার ভঙ্গিটা অন্যরকম, গভীর আবেগে ভরা। নাকি, মেয়েটার প্রতি গোড়া থেকেই তিনি ঘাড় মুচড়ে, ঝুঁকে পড়েছেন ? তাই তার সব কিছুই আলাদা মনে হচ্ছে ?

মল্লিনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই আসব।'

গলা আরো নামিয়ে দেয় মণিকা, 'রাতে অন্য জায়গায় আপনার আর কোনো প্রোগ্রাম নেই তো ?'

'না। কেন ?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।' বলে আবার হাসে মণিকা। তার হাসিতে আগের মতোই পিয়ানো বাজতে থাকে।

মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'অবিনাশ কি এখনও কাছাকাছি আছে ?'

'আছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন ?'

'হ্যাঁ।'

একটু পর অবিনাশের গলা শোনা যায়, 'স্যর, আমি বলছি—'

মল্লিনাথ বলেন, 'আমি তো তোমাদেন ঐ গেস্ট হাউসটা চিনি না। যাব কী করে ?'

'আমি আপনাকে নিয়ে আসতে পারি। কোথায় কখন দেখা করব বলুন।'

একটু চিন্তা করে মল্লিনাথ বলেন, 'অফিসের গাড়িতে যাওয়াটা ভীষণ রিস্কি। তুমি এক কাজ করবে, সান্তাক্রুজ স্টেশনের কাছে একটা বড় কনসার্ন, খুব সম্ভব নামটা 'চোকসি ব্রাদার্স' হবে, ফরেন কার ভাড়া দেয়। ওখান থেকে এখনই গিয়ে একটা এয়ারকন্ডিশানড গাড়ি কয়েক দিনের জন্যে হায়ার করবে। তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে ?'

'আছে স্যর।'

'গুড। সন্ধে সাতটায় গাড়িটা নিয়ে আমার হোটেলে চলে আসবে। গাড়িটা পার্ক করে রিসেপসান লাউঞ্জে আমার জন্যে ওয়েট করবে। আমাকে নিচে থেকে ফোন করো না, বা হুট করে আমার স্যুইটে চলে এসো না। মনে থাকবে ?'

'থাকবে স্যর।'

'তা হলে এখন ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা স্যর।'

পাঁচ

কাঁটায় কাঁটায় দু'টোয় হোটেল স্কাইলাইন-এর একটা কনফারেন্স রুমে বম্বের ডোনা ইন্টারন্যাশনাল-এর চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ভগবানদাস রামদাস পারেখের সঙ্গে মিটিংয়ে বসেন মল্লিনাথ। পারেখ সাহেবের সঙ্গে আগেই তাঁর আলাপ ছিল। ষাটের কাছাকাছি বয়স। ছাত্রজীবনটা তাঁর কেটেছে বিদেশে। দারুণ ডিসিপ্লিনড মানুষ। নিজে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। এই বয়সেও প্রচন্ড পরিশ্রম করতে পারেন। সেই সঙ্গে দূরদর্শীও। দশ বছর পর কী ধরনের প্রোডাক্টের চাহিদা হবে, আগে থেকেই তার পরিকল্পনা ছকে কাজ শুরু করে দেন।

পাক্কা সাহেব হলেও পারিবারিক ট্রাডিসানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে প্রণাম করে কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে নেন। পঞ্জিকায় দিনক্ষণ দেখে তবে নতুন ভেনচারে নামেন। আজকের বেলা দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সময় নাকি সেদিক থেকে অত্যন্ত শুভ।

পারেখ সাহেব সম্পর্কে এসব খবর আগেই কানে এসেছিল মল্লিনাথের। তিনি নিজে অবশ্য পঞ্জিকা টঞ্জিকা মানেন না। তাঁর কাছে প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। যখনই কোনো সুযোগ আসে তৎক্ষণাৎ তিনি সেটা কাজে লাগিয়ে থাকেন। অশ্লেষা মঘা পূর্ণিমা অমাবস্যার কারণে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। আসল ব্যাপারটা হল সংস্কার। একজন সেটা মানেন, আরেক জন মানেন না।

কিন্তু এক জায়গায় দু'জনের আশ্চর্য মিল। মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নিজেদের পরিশ্রম চেষ্টা জেদ এবং ট্যালেন্টের জোরে তাঁরা এতটা উঁচুতে উঠে এসেছেন।

ঠিক দু'টোয় ডোনা ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে হোটেল স্কাইলাইন-এর সব চেয়ে ছোট কনফারেন্স হল্‌টায় জেনিথ

এন্টারপ্রাইজেস-এর মিটিং শুরু হয়ে যায়।

একদিকে পারেখ সাহেব এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁরই অফিসের দু'জন চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট, কোম্পানি ল'-এর একজন ঝানু এক্সপার্ট আর দু'জন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার। আরেক দিকে মল্লিনাথ, তাঁর বম্বে অফিসের মহাদেব কেলকার, ওয়েস্টার্ন রিজিওনে তাঁদের যে সব কারখানা রয়েছে সেখানকার তিনজন ইলেট্রনিক এক্সপার্ট আর কোম্পানি ল'-এর বিশেষজ্ঞ। আগে এতজনের টিম নিয়ে আলোচনায় বসার কথা ছিল না। পরে ঠিক হয়েছে, বার বার কনফারেন্স না করে আজই ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলা। তাতে অযথা সময় নষ্ট হয় না। তাই সব ডিপার্ট-মেন্টের এক্সপার্টদের ডেকে আনা হয়েছে।

আগেই অফিসার পর্যায়ে এই জয়েন্ট ভেনচারটা নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। তাজ দুই কোম্পানির টপমোস্ট লেভেলে আলোচনা হবার পর ব্যাপারটা ফাইনাল হয়ে যাবে, আশা করা যায়। সে জন্য দুই পক্ষই কাগজপত্র রেডি করে এনেছেন।

কুশল বিনিময়ের পর কাজের কথা শুরু হয়ে যায়। ঠিক হয় ছাব্বিশ পারসেন্ট শেয়ার থাকবে মল্লিনাথদের, পঁচিশ পারসেন্ট পারেখসাহেবদের। বাকি ঊনপঞ্চাশ পারসেন্টের ব্যবস্থা হবে এই ভাবে। গভর্নমেন্টের অনুমতি নিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করা হবে। মেশিনপত্র এবং বিদেশ থেকে টেকনিক্যাল নো-হাউ আনার জন্য কত ফরেন এক্সচেঞ্জ লাগবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স এবং ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছ থেকে কত টাকার জন্য অ্যাপ্লাই করা হবে এবং সেসব কিস্তিতে কখন কিভাবে আদায় করতে হবে তারও একটা ছক তৈরি করে ফেলা হয়। আগে থেকেই ঠিক করা আছে, পুনের কাছে লোনিতে নতুন কারখানা বসানো হবে।

দেশের দুই বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস যুক্তভাবে যে নতুন কোম্পানি করতে যাচ্ছেন তার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস কিভাবে গড়া হবে, কেমন হবে তাদের কর্মপদ্ধতি—সেসবও স্থির করা হয়। আজকের এই আলোচনার পর একটা দিনও নষ্ট করা হবে না। সমস্ত বিষয়টা আইনসঙ্গত এবং বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা

এক মাসের মধ্যে করে ফেলা হবে।

আলোচনা শেষ হতে হতে প্রায় পাঁচটা বেজে যায়। তারপর পারেখসাহেব বিনীতভাবে মল্লিনাথকে বলেন, 'চৌধুরীসাহেব, আজ রাতে আপনার কি একটু সময় হবে?'

মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কেন বলুন তো?'

'আপনার অনারে আমরা ডিনারের আয়োজন করতে চাই তাজমহল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ। আপনার অনুমতি পেলে—'

বিদ্যুৎচমকের মতো মণিকার মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে মল্লিনাথের। হাতজোড় করে তিনি বলে, 'ক্ষমা করবেন, আজ আমার অন্য একটা কাজ আছে।'

'ত হলে কাল?'

মল্লিনাথ আগেই ঠিক করে ফেলেছিলেন, যে ক'দিন বম্বেতে থাকবেন, রাত কাটাবেন জুহুর সেই গেস্ট হাউসটায়। তিনি বিব্রতভাবে বলেন, 'রাতের দিকটা বাদ দিলে ভাল হয়।'

পারেখসাহেব বলেন, তা হলে লাঞ্চেরই ব্যবস্থা করা যাক।'

ঠিক হয়, কাল দুপুরে মল্লিনাথের সম্মানে তাজ হোটেলে লাঞ্চের আয়োজন করবেন পারেখসাহেব। আর পরশু দুপুরে সেন্টুর হোটেলে পারেখসাহেবের সম্মানে লাঞ্চ দেবেন মল্লিনাথ। বম্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর কমার্সিয়াল ওয়ার্ল্ডের সব ভি. আই. পি'কে দুই লাঞ্চেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

কনফারেন্সের পর কেলকার এবং অফিসারদের সঙ্গে ব্যাকে বে রিক্লেমেসানে চলে আসেন মল্লিনাথ। এখানে একটা সাতাশতলা হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের ছ'টা ফ্লোর জুড়ে তাঁদের অফিস। বাড়িটা তাঁদের নিজস্ব নয়, ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তবে খুব বেশিদিন তাঁরা এখানে থাকছেন না, ওরলিতে জমি কেনা হয়ে গেছে। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের প্ল্যানও বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেসন পাস করে দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে। আশা করা যায়, বছর দুই আড়াই-এর ভেতর নিজস্ব বিল্ডিংয়ে তাঁরা অফিস তুলে আনতে পারবেন।

ব্যাক বে রিক্লেমেসানে এসে ঘন্টাখানেক অফিসে কাটান মল্লিনাথ। কিছু জরুরি কাগজপত্রে সই করেন। তারপর একটা

ডিপার্টমেন্টে এমপ্লয়ীদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

মল্লিনাথ ইচ্ছা করলে তাঁর চেম্বারে বসে কর্মচারীদের ডেকে পাঠাতে পারেন কিন্তু কখনই তা করেন না, নিজে ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ঘুরে তাদের কাছে যান। এটা তাঁর একটা সূক্ষ্ম কৌশলও। এমপ্লয়ীরা তাঁকে নিজেদের একজন ভাবুক, এটাই তিনি চান। দূরত্ব বজায় রাখলে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি হতে বাধ্য। সম্পর্কটা সহজ করতে পারলে বহু টেনসান কেটে যায়। আজকাল শ্রমিক-কর্মচারী আর ম্যানেজমেন্টের মধ্যে সর্বক্ষণই উত্তেজনা আর লড়াইয়ের মনোভাব। এটা যতটা কাটানো যায় ততই কোম্পানির পক্ষে ভাল। সবসময় সংঘর্ষ চললে গ্রোথ হবে কী করে?

শুধু বম্বে কলকাতা বা বাঙ্গালোরের অফিসেই না, প্রোডাকসান ইউনিটগুলোতেও চলে যান মল্লিনাথ। শতকরা পঁচিশ ভাগ এমপ্লয়ীর তিনি নাম জানেন। এই যে মল্লিনাথ কর্মচারীদের কাছে গিয়ে কথা বলেন, তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার খবর নেন, এতে কাজ হয়েছে প্রচুর। তাঁদের কোম্পানির কোনো ইউনিটে গত দশ বছরে একবারের বেশি স্ট্রাইক বা লক-আউট হয় নি। শিল্পে কখনও অশান্তি দেখা দিলে তা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, দশ পনের দিনের মধ্যে মিটে গেছে। এমপ্লয়ীদের সঙ্গে এই যোগাযোগ রাখাটা মল্লিনাথের সাফল্যের একটা বড় কারণ।

অফিসের সবগুলো ফ্লোরে আজ আর ঘোরা হয় না। কেননা সাতটায় স্কাইলাইন হোটেলে অবিনাশকে আসতে বলে দিয়েছেন মল্লিনাথ। কথামতো সে রিসেপসান লাউঞ্জে বসে থাকবে। ঠিক সাড়ে ছ'টায় তিনি কেলকারকে বলেন, 'এখন আমাকে হোটেলে ফিরতে হবে।'

কেলকার অবাক হয়ে যান। ফি বার বম্বে এলে প্রথম দিনই মল্লিনাথ অফিসের সবগুলো ডিপার্টমেন্ট ঘুরে দেখেন। কিন্তু আজ মাত্র একটা ডিপার্টমেন্টে গেছেন। তা ছাড়া তাঁকে বেশ অন্যমনস্কও দেখাচ্ছে। কেলকার বলেন, 'শুধু অ্যাকাউন্টস-এই আজ যাওয়া হল, অন্য ডিপার্টমেন্টগুলোর এমপ্লয়ীরা আপনার

জন্যে আশা করে বসে আছে স্যর।'

একটু বিব্রত বোধ করেন মল্লিনাথ। যে ডিপার্টমেন্টেই তিনি যান, কর্মচারীরা তাঁকে সাদরে এবং সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানায়। যেন জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর অসীম ক্ষমতাবান সর্বেসর্বা মানুষটি নন, তাদের এক অতি প্রিয়জনকে কাছে পেয়েছে। মল্লিনাথ বলেন, 'ওদের খবর দিন, কাল তাড়াতাড়ি এসে সবার সঙ্গে কথা বলব।'

ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ হয় না কেলকারের। কিন্তু কোম্পানির সর্বময় অথরিটির মুখের ওপর তো বলা যায় না, তিনি আজ না গেলে এমপ্লয়ীরা দুঃখ পাবে। কেলকার শুধু বলেন, 'ঠিক আছে স্যর, আমি এখনই ওদের সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

মল্লিনাথ বলেন, 'আরেকটা কথা—'

কিছু না বলে উন্মুখ হয়ে থাকেন কেলকার।

মল্লিনাথ থামেন নি, 'যে ক'দিন বম্বেতে আছি, আমাকে রাত্তিরে সাতটার পর হোটেলে পাবেন না।'

কেলকার জিজ্ঞেস করেন, 'রাতে কি কোথাও যাবেন?'

'এ সম্বন্ধে প্লিজ কোনো প্রশ্ন নয়।'

'তা হলে—'কথা শেষ না করে থেমে যান কেলকার।

তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন মল্লিনাথ। যখনই তিনি বম্বে আসেন তাঁর গতিবিধির সব খবরই কেলকারকে আগে থেকে জানিয়ে দেন। কিন্তু এবার তাঁর আচরণ কেলকারের কাছে খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও কেলকার যে খুব অবাক হয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। মল্লিনাথ বলেন, 'আমি দশটার ভেতর হোটেলে ফিরে আসব। টু-মরো অ্যাট শার্প ইলেভেন, আই উড বী অ্যাট দা অফিস।'

কেলকার বলেন, 'ঠিক আছে স্যর। কাল কিন্তু দুপুরে পারেখ-সাহেবরা লাঞ্চ দিচ্ছেন—'

মল্লিনাথ হাসেন, 'মনে করিয়ে দিতে হবে না। আই ডোন্ট ফরগেট এনিথিং, ওয়ান্স আই অ্যাকসেপ্ট।'

ব্যাক বে রিক্লেমেসান থেকে হোটেলে ফিরে মল্লিনাথ শোফারকে বলেন, 'কারলেকে চলা যাও, কাল সুবেহ্ দশ বাজে ইঁহা আনা।'

'জি—' শোফার মল্লিনাথকে স্যালুট করে চলে যান।

বিশাল রিসেপসান হল্‌-এ ঢুকতেই মল্লিনাথ দেখতে পান ডান পাশের লাউঞ্জে বসে আছে বিশ্বস্ত, অনুগত, সময়ানুবর্তী অবিনাশ। স্নায়ু টান টান করে সে অপেক্ষা করছিল, তাঁকে দেখামাত্র প্রায় দৌড়েই কাছে চলে আসে। বলে, 'স্যর, এখনই বেরুবেন তো? না কি ওপরে আপনার স্যুইট থেকে ঘুরে আসবেন?'

মল্লিনাথ জানান, ওপরে আর যাবেন না। কেননা, হোটেলে থাকলে এমন কারো ফোন হয়ত আসতে পারে, যার ফলে তিনি আটকে যাবেন, জুহুতে যাওয়াটাই বানচাল হয়ে যাবে।

মল্লিনাথ বলেন, 'না, এখান থেকেই চলে যাব। গাড়ির ব্যবস্থা করেছ তো?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'চল।'

কার পার্কিং জোনে একটা দুর্দান্ত এয়ারকন্ডিশানড গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। অবিনাশ মল্লিনাথকে সেটার কাছে এনে দরজা খুলে দেয়, 'উঠুন স্যর।'

অবিনাশের তুলনা নেই। ঠিক যেমন গাড়ি মল্লিনাথের পছন্দ ঠিক তেমনটিই ভাড়া করেছে সে। তিনি উঠে বসতেই অবিনাশও শোফারের সিটে উঠে স্টার্ট দেয়। হোটেল কমপাউন্ড থেকে বেরিয়ে বম্বের মসৃণ চকচকে রাস্তার ওপর দিয়ে দামী ফোরেন কার মেরিন ড্রাইভ, চৌপাট্টি, মেরিন লাইনস পেরিয়ে পাখির মতো উড়ে যায়।

ছয়

আরব সাগরের পারের এই গমগমে শহরটিতে সূর্যোদয়ের মতো সূর্যাস্তও হয় দেরিতে। সারা দেশে সন্ধে নামার অনেক পর এখানে দিনের আলো নেভে।

মল্লিনাথেরা যখন জুহুতে পেঁছন, আরব সাগরের জলে সূর্য

প্রায় ডুবে গেছে। শুধু মাথার দিকটা একটুখানি দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওটুকুও আর থাকবে না, অথৈ সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।

রোদ নেই বললেই চলে। পশ্চিম আকাশের গায়ে দিনের শেষ আলো হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের ফিকে রক্তাভার মতো আলতোভাবে লেগে আছে।

গেস্ট হাউসটা জুহু বীচের গায়েই। গাড়িটা কমপাউন্ডের ভেতর পার্ক করে মল্লিনাথকে নামিয়ে অবিনাশ বলে, 'আসুন স্যর।'

পার্কিং এরিয়ার গা থেকে চমৎকার পাথরের পথ সোজা গেস্ট হাউসের বিশাল পাঁচতলা বাড়িটার পোর্টিকো পর্যন্ত চলে গেছে। তার দু'পাশে ছাতার আকারে একই মাপের কোমর সমান হাইটের ঝাউয়ের লাইন। তারপর ডান দিকে টেনিস কোর্ট, বাঁদিকে উঁচু উঁচু পাম গাছে ঘেরা সুইমিং পুল। পুলের ধারে টাইলস বসানো বসার জায়গায় লাল নীল আমব্রেলার তলায় ফ্যাশনেবল চেয়ার কিংবা সোফা। এই মুহূর্তে পুলের স্বচ্ছ নীলাভ জলে দুর্ধর্ষ চেহারার জলপরীরা সাঁতার কেটে চলেছে। ওপরে ছাতাগুলোর তলায় কিছু যুবতী সুইমিং কস্টিউম পরে বসে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তারা জলে নেমে যাবে। আর আছে অদ্ভুত ট্রাউজার্স, হাফ প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি বা শার্ট পরা, খালি মাথা বা স্ট্র হ্যাট চাপানো, চোখে চাকার সাইজের গগলস, নিখুঁত কামানো মুখ বা গালে ঝুলপি চাপ দাড়ি—ইত্যাদি নানা টাইপের, নানা বয়সের সব পুরুষ। তার মধ্যে সেই জার্নালিস্টটি—পাক্ষিক দিনকাল-এর তরুণ দত্ত—যে একটা পাওয়ারফুল ক্যামেরা নিয়ে বসে আছে, মল্লিনাথরা লক্ষ করেন না। রক্তের দাগ শুঁকে শুঁকে যেমন শিকারী কুকুরেরা আসে, তেমন এই সাংবাদিকটি গেস্ট হাউসে এসে হাজির হয়েছে। মল্লিনাথেরা জানেন না, আজ সকালে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশন থেকেই অবিনাশদের ধাওয়া করে এখানে চলে এসেছিল সে। তারপর এই গেস্ট হাউসেই একটা ঘর ভাড়া করে আছে। কাল থেকে চৌপট্টির কাছে একটা হল-এ তাদের সর্ব-ভারতীয় ইউনিয়নের যে কনফারেন্স শুরু হচ্ছে তাতে যে মাঝে

মাঝে যাবে ঠিকই, তবে সেটা নিয়ম রক্ষার জন্যই। কাজ সারা হয়ে গেলেই সে এখানে ফিরে আসবে। তার ধ্যানজ্ঞান, এখন সব কিছুই মল্লিনাথকে ঘিরে। ভি. টি স্টেশনে যে মেয়েটির দিকে মল্লিনাথ পা বাড়িয়ে অবিনাশের ইশারায় থমকে যান তার সঙ্গে তাঁর সত্যিকার সম্পর্কটা কী সেটা বার করতে পারলে, সাংবাদিক-টির ধারণা, মিলিয়ন ডলার লটারি পাওয়ার মতো একটা ব্যাপার ঘটে যাবে।

তরুণ দত্তদের পাক্ষিক রঙিন ট্যাবলয়েড কাগজটা প্রথম ইস্যু থেকে কেচ্ছাই ছাপিয়ে আসছে। ওই মেয়েটি আর মল্লিনাথকে জড়িয়ে যদি সেনসেসানাল স্টোরির মালমশলা পাওয়া যায়, ছবি দিয়ে সাজিয়ে ধারাবাহিক বার করে যাবে। দুটো ইস্যু বেরুতে না বেরুতেই সার্কুলেসান চড় চড় করে বিশ পঁচিশ হাজার বেড়ে যাবে, সন্দেহ নেই। তবে কিনা মল্লিনাথ বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, দেশজোড়া তাঁর নাম। তাঁর সম্বন্ধে কিছু ছাপতে গেলে আটঘাট বেঁধে নামতে হয়, হাতে সলিড ডকুমেন্ট রাখতে হয়, নইলে মান-হানির কেস করলে কাগজ তো বন্ধ হবেই, জেল জরিমানা কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাই আসল জায়গায় এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে তরুণ।

ওদিকে মল্লিনাথকে সঙ্গে নিয়ে গেস্ট হাউসের বড় বিল্ডিংটায় গিয়ে লিফটে করে টপ ফ্লোরে চলে আসে অবিনাশ। একেবারে ডান দিকের শেষ কোণে একটু আলাদাভাবে যে স্যুইটটা রয়েছে, তারা এসে সেটার কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে হাতজোড় করে মণিকা মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার মুখে স্নিগ্ধ, রহস্যময় একটু হাসি।

পেছন থেকে চাপা গলায় ফিস ফিস করে অবিনাশ, 'আমি যাই স্যর। মণিকা আমার রুম নাম্বার জানে। দরকার হলে ফোন করলেই চলে আসব।' সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। জানে আপাতত তার আর কোনো ভূমিকা নেই। মল্লিনাথের উত্তরের জন্য সে আর অপেক্ষা করে না, নিঃশব্দে কার্পেট-বিছানো করিডরের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন মল্লিনাথ। খুব সম্ভব কিছুক্ষণ

আগে স্নান করেছে মণিকা। পরনে চাঁপা রঙের জমির ওপর কাজ-করা বালুচরী শাড়ি আর ঐ রঙেরই ব্লাউজ। চুল চমৎকার করে বেঁধে সাদা ধবধবে জুঁই আর গোলাপ দিয়ে সাজানো। ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক, চোখের তলায় সরু কাজলের টান। কপালে বড় করে গোলাপি টিপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে তেলতেলে মসৃণ কিছু একটা মাখানো। তার আংটি এবং নাকছাবি থেকে হীরের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। শাড়ি, চুল, মুখাবয়ব—সবকিছু থেকে মৃদু অলৌকিক সুগন্ধ উঠে আসছে।

বালুচরী শাড়ি, ফুল, হালকা সুবাস—এ সবই মল্লিনাথের বড় প্রিয়। সব মিলিয়ে সমস্ত জীবন যে কাম্য নারীটিকে মনে মনে মল্লিনাথ চেয়ে এসেছেন, এই মুহূর্তে সে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মণিকা বলে, 'কী হল, ভেতরে আসুন—'

টেলিফোনে মণিকার যে কণ্ঠস্বর মল্লিনাথ শুনেছিলেন সেটা এখন আরো সুরেলা, আরো পরিষ্কার এবং আরো দানাওলা।

মল্লিনাথ যেন ঘোরের মধ্যে স্যুইটে ঢোকেন।

মণিকা বলে, 'ওধারে, সমুদ্রের দিকে একটা বড় ব্যালকনি আছে। ওখানে বসলে ভাল লাগবে।'

মণিকা কী চায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না মল্লিনাথের। গোড়া থেকেই তার ইচ্ছেয় নিজেকে সঁপে দেন তিনি। বলেন, 'বেশ তো, চল—'

সত্যি ব্যালকনিটা চমৎকার। এই গেস্ট হাউসটার পর সারি সারি অগুনতি নারকেল গাছ, তারপর বাদামি বালির সীমাহীন বীচ, বীচের গা থেকে আদিগন্ত সমুদ্র—আরব সাগর।

বীচে এখন হাজার হাজার মানুষ। বেশির ভাগই বম্বের বাসিন্দা, তাছাড়া রয়েছে প্রচুর ফরেন ট্যুরিস্ট। ভেলপুরি, বাটাটাপুরি, কোল্ড ড্রিংক, ইডলি-দোসা-সমোসার সারিবদ্ধ দোকানগুলোতে থিকথিকে ভিড়, ভিড় 'নারিয়েলপানি'ওলাদের কাছেও। উট আর টাট্টু ভাড়া নিয়ে 'জয় রাইড' করে বেড়াচ্ছে অনেকে।

সমুদ্রের দিক থেকে ঝড়ো হাওয়া উঠে এসে নারকেল বনের

ঝুঁটি ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিতে দিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আওয়াজ উঠছে সাঁই সাঁই। আকাশ, সমুদ্র, বাদামী বালির বীচ—সমস্ত কিছুকে ঢেকে দিয়ে পাতলা মসলিনের মতো নেমে আসছে অন্ধকার।

ব্যালকনিতে কয়েকটা গদিমোড়া বেতের সোফা আর নিচু গ্লাস-টপ টেবল সাজানো রয়েছে।

মণিকা বলে, 'বসুন—' মল্লিনাথ, একটা সোফায় বসলে সে তাঁর ডান পাশে কোনাকুনি বসে পড়ে।

একটু চুপচাপ।

তারপর মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

মণিকা বলে, 'এত আরামে আগে কখনও থাকিনি।'

'এতে আমার চেয়ে অবিনাশের কৃতিত্ব অনেক বেশি। সে-ই খুঁজে খুঁজে সমুদ্রের পাড়ে এই গেস্ট হাউসটা বার করেছে।'

'অবিনাশবাবুর রুচিটা খুবই ভাল। 'তবু বলব আপনার দয়ায় এখানে আসা সম্ভব হল।'

'আগে আর বম্বে আসোনি?'

'না। এই প্রথম।'

একটু ভেবে মল্লিনাথ বলেন, 'অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম চলে আসব কিন্তু নানা কাজে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে এর আগে আর আসতে পারলাম না।'

মণিকা বলে, 'আমি তো ভেবেছিলাম. আজও আমাদের দেখা হবে কিনা। জয়েন্টলি যে কারখানা বসাতে এবার বম্বেতে এসেছেন সে ব্যাপারটা ফাইনাল হল?'

অপার বিস্ময়ে বেশ খানিকটা সময় মণিকার দিকে তাকিয়ে থাকেন মল্লিনাথ। পয়সাওলাদের গোপন সঙ্গদান করাটা যে মেয়েটির প্রফেসান, তার কাছে তাঁদের নতুন ভেনচার সম্পর্কে শুনবেন, এটা একেবারেই অভাবনীয়। চমকটা থিতিয়ে এলে মল্লিনাথ বলেন, 'তুমি ইণ্ডাস্ট্রির ব্যাপারে খবর রাখো?'

'না।'

'তবে?'

'অবিনাশবাবু কলকাতায় আপনার কথা যখন প্রথম বললেন, খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এত বড় মানুষের কাছে কখনও যাবার সৌভাগ্য হয়নি। তাই আপনার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিতে লাগলাম। এখানে আসার দিন কাগজে দেখলাম আপনি বম্বেতে এখানকার বড় কোম্পানির সঙ্গে একটা জয়েন্টলি কী একটা ফ্যাক্টরি বসাতে যাচ্ছেন। আজ যখন সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন তখন মনে হল নিশ্চয়ই ওই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।'

মেয়েটা যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং সুশিক্ষিত, আগেই বোঝা গিয়েছিল। নতুন করে আরেক বার তা টের পাওয়া গেল। কিন্তু এখানকার জয়েন্ট ভেনচারের কথা আগে কাউকে জানানো হয়নি। মল্লিনাথ ভেবে রেখেছিলেন, ডোনা ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়ে যাবার পর প্রথমে বম্বে, পরে কলকাতার প্রেসকে ডেকে খবরটা দেওয়া হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা আর গোপন নেই। তবে সুকুমার হয়ত জানে না। জানলে ট্রেনে তাঁকে জিজ্ঞেস করত। কিন্তু খবরটা ফাঁস হয়ে গেল কী করে? নাঃ, সব খবরের কাগজওলাদের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় না। গোয়েন্দাদের মতো সাংবাদিকরা সারাক্ষণ ওত পেতে আছে। কে কিভাবে জেনেছে, কে জানে।

মল্লিনাথ দু'হাত উল্টে দিয়ে অল্প হাসেন। বলেন, 'নাঃ, জার্নালিস্টদের লুকিয়ে কিছু করার উপায় নেই।' একটু থেমে মজার গলায় এবার বলেন, 'কে জানে, এই যে আমরা দু'জনে বসে গল্প করছি, প্রেসের কেউ তাও লক্ষ করছে কিনা।'

মণিকাও হাসে। বলে, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। রাতের দিকে কি স্নান করার অভ্যেস আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্নান না করলে ঘুমোতেই পারব না।'

'তা হলে আর কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে স্নানটা সেরে নিন, ফ্রেশ লাগবে। আমি ততক্ষণে চায়ের ব্যবস্থা করছি।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় মল্লিনাথের। একটু জোর দিয়েই বলে ওঠেন, 'এই রে—'

'কী হল?'

'আমি তো জামাকাপড় কিছুই আনিনি। স্নান করার পর

চেঞ্জ করব কী করে ?'

মণিকা হেসে হেসে জানায়, তার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কলকাতা থেকে আসার আগে অবিনাশের সঙ্গে প্রচুর পরামর্শ করেছিল সে। মল্লিনাথ যে বম্বেতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গেস্ট হাউসে এসে থাকবেন, সেটা তো জানাই ছিল। তাঁর আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে একটা আলাদা সুটকেসে একপ্রস্থ জামাকাপড় আর দরকারী জিনিস ভরা হয়েছিল। নিজেদের জিনিসপত্র ছাড়া সেই সুটকেসটা নিয়ে পরশু বম্বে মেলে চেপেছিল তারা। কাজেই মল্লিনাথের দুর্ভাবনার কারণ নেই।

মল্লিনাথ মুগ্ধ চোখে মণিকার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ—' তারপর জুতো খুলে সোজা টয়লেটে চলে যান। সেখানে বাড়িতে পরার জন্য ধবধবে পাজামা, পাঞ্জাবি আর ঢিলেঢালা সিল্কের হাউসকোট ঝোলানো রয়েছে। রয়েছে নানা ধরনের পারফিউম, সাবান, টুথব্রাশ, পেস্ট, চিরুনি, হেয়ার ব্রাশ, তোয়ালে, ফোমের দামী স্লিপার।

স্নান সেরে, পোশাক পালটে, ফিটফাট হয়ে বাইরে আসতেই মল্লিনাথের চোখে পড়ে, স্যুইটের সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। টেপে মৃদু লয়ে বিসমিল্লা খানের সানাইয়ের রেকর্ড বাজছে। নিশ্চয়ই ওটা চালিয়ে দিয়েছে মণিকা। মনটা দারুণ খুশি হয়ে যায় মল্লিনাথের। গানবাজনা তাঁর ভীষণ প্রিয়। বিশেষ করে ক্লাসিকাল সং আর মিউজিক। নিজে কোনোদিন চর্চা করার সুযোগ পাননি। কম বয়সে স্কুল মাস্টার বাবাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার চালাতে হ'ত। তখন গানটানের কথা ভাবাই যেত না। পরে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর দায়িত্ব নেবার পর অঢেল পয়সা অবশ্য হাতে এল কিন্তু তখন আর সময় নেই। প্রচণ্ড কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে ক্বচিৎ কখনও মিউজিক কনফারেন্সে গানবাজনা শুনতে যেতেন। তবে নিয়মিত প্রতি মাসে গানের রেকর্ড কিনিয়ে আনতেন। ওয়েস্টার্ন পপ থেকে হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত নজরুলের গান, পল্লীগীতি, ইত্যাদি কত যে রেকর্ডের কালেকশান তাঁর, হিসাব নেই। রেকর্ডের

এত বড় লাইব্রেরি সারা দেশে ক'জনের আছে, বলা মুশকিল।

আগে আগে তবু দু-একটা রেকর্ড বাজিয়ে শুনতেন কিন্তু পরে কাজের চাপ এত বেড়ে যেতে থাকে যে সে সব শোনার সময়ই পাওয়া যায় না। এখন তো মাসের বেশির ভাগটা বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। কলকাতায় থাকলে সকালে বেরিয়ে যান, ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। শরীর তখন এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে কোনোরকমে ডিনার সেরে বিছানায় নিজেকে সঁপে দিতে না দিতেই দু চোখ জুড়ে আসে। এর ভেতর গান বাজনার অবসর কোথায়? লাইব্রেরিতে রেকর্ডের সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকে।

মণিকা ব্যালকনিতে বসে ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'এখানে আসুন—'

ব্যালকনিতে দুটো নিচু টেবলে চায়ের সরঞ্জাম এবং প্রচুর খাবার দাবার রয়েছে। মল্লিনাথ বসলে ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে প্লেটে প্লেটে ধোঁয়া-ওঠা গরম ফিশ ফ্রাই, ভাল ঝাঁঝালো মাস্টার্ড, কাজু বাদাম, স্যালাড, উৎকৃষ্ট তালশাঁস সন্দেশ আর বাদাম বরফি সাজিয়ে তাঁর সামনে রাখে মণিকা।

এই সব খাবার মল্লিনাথের খুবই প্রিয়। সেই দুপুরে লাঞ্চ খেয়েছেন, তারপর দু-তিন কাপ কফি ছাড়া পেটে আর কিছু পড়ে নি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। ফ্রাই-এর প্লেটটা তুলে নিয়ে মাস্টার্ড আর সস মাখিয়ে একটা টুকরো মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে চোখ বুজে আস্বাদ নিতে নিতে তৃপ্তিসূচক একটা শব্দ করেন, 'চমৎকার। খাঁটি টাটকা ভেটকিই দিয়েছে। আর ভাজাটাও হয়েছে একসেলেন্ট। নাঃ, অবিনাশকে তারিফ করতেই হচ্ছে। খুঁজে খুঁজে ভাল একটা গেস্ট হাউস বার করেছে, দেখছি।'

মণিকা ঠোঁট টিপে হাসছিল।

মল্লিনাথ চোখ মেলে হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে একটু অবাকই হন। বলেন, 'হাসছ যে!'

মণিকা বলে, 'এমনি। ও কিছু না।'

মল্লিনাথ একটু জোর দিয়েই বলেন, 'উঁহু, নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে।'

'কী আবার থাকবে!'

এবার প্রায় জোরই করতে থাকেন মল্লিনাথ, 'বল, প্লিজ বল—'

মুখ নিচু করে মণিকা বলে, 'ফ্রাইগুলো গেস্ট হাউস থেকে আসে নি। এখানে এসে অবিনাশবাবুকে দিয়ে বাজার থেকে মাছ আনিয়ে সব রেডি করে রেখেছিলাম। আপনি স্নান করতে ঢুকলে ভেজে ফেলেছি।'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন মল্লিনাথ। তারপর বলেন, 'গ্যাস, বাসনকোসন কোথায় পেলে?'

মণিকা জানায়, অবিনাশ গেস্ট হাউসের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে স্যুইটের ভেতর একটা ছোট অ্যান্টিরুমকে সাময়িক কিচেন করে নেবার ব্যবস্থা করেছে। টাকায় কী না হয়?

মল্লিনাথ বলেন, 'হঠাৎ তোমার রান্নার খেয়াল হল?'

'আপনি আমার রান্না খেলে খুশি হবেন, ধরুন সেটাই কারণ। আপনাকে আনন্দ দেবার জন্যেই তো আমার এখানে আসা।' বলতে বলতে মুখ নিচু করে মণিকা।

সেক্স ছাড়াও মেয়েটার ভেতর আরো কিছু আছে যা মনকে অসীম তৃপ্তিতে ভরে দেয়। তিনি বলেন, 'তুমি যদি খুশি হও, আমার আর কী বলার আছে। রাতেও কি রান্নার ব্যবস্থা করেছ?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ মল্লিনাথের চোখে পড়ে মণিকা কিছুই খাচ্ছে না। বলেন, 'ও কি, তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ যে? একটা কিছু নাও।'

মণিকা বলে, 'অনেক বেলায় খেয়েছি। এখন একদম খিদে নেই। আপনার খাওয়া হোক, পরে একসঙ্গে চা খাব।'

মল্লিনাথ অন্যমনস্কের মতো বলেন, 'ফ্রাইয়ের ব্যাপারটা বোঝা গেল, কাজু বাদামও এই শহরে কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু তালশাঁস সন্দেশটা জোটালে কোত্থেকে? নিজের হাতেই করেছ নাকি!'

'অত গুণ আমার নেই। কলকাতার একটা নাম-করা মিষ্টির দোকানের নাম করে মণিকা বলে, 'ওগুলো ওখান থেকে কিনে এনেছি।'

গেস্ট হাউসটার সামনে জুহু বীচ, তার ওধারে আরবসাগর। পেছন দিকে চওড়া অ্যাসফাল্টের রাস্তা। রাস্তার পর বিশাল বিশাল

সব হোটেল কিংবা হাইরাইজ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স। সব জায়গায় নানা রঙের আলো জ্বলছে। রাস্তায় রাস্তায় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বাতিগুলোও জ্বলে উঠছে। দূরে আবছা অন্ধকারের দোপাট্টায় ঢাকা আরব সাগর থেকে ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। সেইসঙ্গে রয়েছে একটানা হাওয়ার শনশনানি। সব মিলিয়ে গোটা পরিবেশটা অপার্থিব স্বপ্নের মতো।

একসময় চা খেতে খেতে মল্লিনাথ বলেন, 'আমার সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর তো নিয়েছ। এবার তোমার কথা বল—'

মণিকা একটু চমকে ওঠে। বলে, 'আমার আবার কী কথা! আমি খুব তুচ্ছ একটা মেয়ে।'

গভীর গলায় মল্লিনাথ বলেন, 'তুমি নিজেই জানো তুমি তুচ্ছ নও। আমি অন্তত তোমার মতো মেয়ে আগে আর দেখি নি। তোমার কথা শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'

ঘরের ভেতর টেপে এখনও বিসমিল্লার সানাই বেজে চলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না মণিকা। ঝাপসা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর নিচু গলায় যা বলে যায় তা এইরকম।

মণিকার মা মনোরমা ছিল ভাল বংশের মেয়ে। যৌবনে পদস্খলনের কারণে তার জীবনটা একেবারে ছারখার হয়ে যায়। যাকে সে ভালবেসেছিল সে ছিল দুশ্চরিত্র, বদমাশ। লোকটা তার সবটুকু শাঁস লুটেপুটে নিয়ে কলকাতার এক নোংরা পাড়ায় নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু সেখানে তাকে বেশিদিন থাকতে হয় নি।

মনোরমা ছিল অসাধারণ সুন্দরী। হঠাৎই কলকাতার এক নামকরা বনেদী ফ্যামিলির এক যুবকের নজরে পড়ে যায় সে। যুবকটি তাকে জঘন্য বেশ্যাপাড়া থেকে নিয়ে তোলে ছিমছাম এক ফ্ল্যাটে। ওখানেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছে মনোরমা। যুবকটি মানুষ হিসেবে ভাল কিন্তু মেরুদণ্ডের জোর ছিল না। মনোরমার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরামের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সে কিন্তু তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে সাহস পায় নি।

যুবকটির পূর্বপুরুষ কলকাতার এসেছিল গত শতাব্দীর

মাঝামাঝি। প্রায় দেড় শ' বছর ধরে তারা এই শহরের বাসিন্দা। বাবু কালচার বলে যে ব্যাপারটা তার পত্তন যাদের হাতে হয়েছিল তাদের মধ্যে যুবকটির ঠাকুরদার ঠাকুরদা, বা তারও ঠাকুরদা ছিল। সেই ট্রাডিশান এখনও বজায় রয়েছে। তবে পয়সার জোর আগের মতো না থাকায় জাঁকজমকটা অনেক কমে গেছে। সে আমলের জেল্লাও আর নেই।

যুবকটির ফ্যামিলির রেওয়াজ ছিল, ছেলেরা বাইরে যে যত পারে চুটিয়ে ফুর্তিফার্তা আর লাম্পট্য করুক, আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়ির ভেতর কোনোরকম বেয়াদপি সহ্য করা হবে না। প্যারিবারিক ঠাটবাট এবং শুচিতা সেখানে বজায় রাখতেই হবে। পুরুষ পরম্পরায় এই প্রথাটি চালু ছিল, যাকে নিয়ে বাইরে ফুর্তি করা হবে তাকে অন্তঃপুরে ঢোকানো চলবে না। লাম্পট্যের জন্য অজায়গা কুজায়গা এবং দুষ্কুল থেকে মেয়েমানুষ জোগাড় করা যেতে পারে কিন্তু বিয়েটি করতে হবে সদ্বংশের কোনো সুশীলা সুলক্ষণা মেয়েকে। স্ত্রীর মর্যাদা একমাত্র তারই প্রাপ্য। আসলে যুবকটির পরিবারে ওপরে ছিল ঘোমটা, তলায় চলত খ্যামটা।

ফি সপ্তাহে তিন রাত মনোরমার সঙ্গে কাটিয়ে যেত যুবকটি। বাকি চার রাত থাকত বাড়িতে সতীসাধ্বী ধর্মপত্নীর কাছে।

তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন মনোরমার একটি মেয়ে হল। সেই মেয়েই মণিকা।

মেয়ের আদরযত্নের কোনো ত্রুটি হয় নি। বড়লোকের বাচ্চার মতোই সে মানুষ হতে থাকে। বছর পাঁচেক যখন বয়স, তাকে ভর্তি করা হয় কনভেন্ট স্কুলে। লেখাপড়ায় ভালই ছিল মণিকা। ক্লাস ফোরে ওঠার পর তাকে ভাল ওস্তাদের কাছে গান শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

জীবনটা মসৃণ নিয়মে কেটে যাচ্ছিল কিন্তু যেবার সে দিল্লী বোর্ডের শেষ পরীক্ষায় বসবে সে বছর সেই যুবকটি মারা যায়। মৃত্যুর আগে মনোরমার নামে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছিল সে। সেই টাকা ভাঙিয়ে আরো কিছুকাল চালিয়েছে মা কিন্তু মণিকা যেবার সেকেণ্ড ইয়ারে উঠল, মনোরমা ক্যানসারে মারা যায়। তখন ব্যাঙ্কের টাকা প্রায় শেষ। পড়াশোনা গানবাজনা বন্ধ

হয়ে গেল মণিকার।

পিতৃপরিচয় দেবার উপায় ছিল না। কিন্তু মণিকার যা মাতৃ-পরিচয় তা দিয়ে সম্মানজনকভাবে এদেশে বেঁচে থাকা যায় না। পৃথিবীর আসল চেহারাটা কী, এতদিন বিশেষভাবে টের পায় নি মণিকা, তাকে আগলে আগলে রেখেছিল তার মা। এইবার চারিদিক থেকে আগুনের আঁচ এসে লাগতে থাকে গায়ে।

মণিকা একেবারে শেষ হয়ে যেত। হয় নি যে, তার কারণ অবিনাশ। মনোরমাকে যখন সেই শয়তানটা বেশ্যাপাড়ায় ফেলে দিয়ে যায় তখন থেকেই অবিনাশের সঙ্গে তার আলাপ। লোকটা যদিও পিম্প বা দালাল তবু তার একটা ভাল অন্তঃকরণ ছিল। নোংরা ঘাঁটলেও শুধু পয়সাটাই অবিনাশের কাছে একমাত্র ব্যাপার ছিল না। সে ছিল মনোরমার শুভাকাঙ্ক্ষী। বেশ্যাপাড়া থেকে মনোরমা ফ্ল্যাটে চলে গেলেও অবিনাশ তার সঙ্গে যোগাযোগটা বরাবর রেখেই গেছে। ফলে ছেলেবেলা থেকেই অবিনাশকে চেনে মণিকা।

মা মারা যাবার পর অবিনাশ তার সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। এজন্য কত লোকের যে সে হাতেপায়ে ধরেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু কোথাও তেমন কাজকর্ম জোটেনি। তাই শেষ পর্যন্ত জীবনের অন্ধকার রাস্তাতেই পা ফেলতে হয়েছিল মণিকাকে। অবিনাশ অবশ্য এ লাইনের আর দশটা সস্তা মেয়ের মতো তাকে নরকে পুরোপুরি তলিয়ে যেতে দেয় নি। তার জন্য পয়সাওলা রুচিসম্পন্ন ক্লায়েন্ট জোগাড় করে এনে দিয়েছে এবং এখনও তাই করে চলেছে।

কথা শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে মণিকা। তারপর ভারী গলায় বলে, 'এই হল আমার ইতিহাস। জীবনটা এভাবেই কেটে যাবে।' বলতে বলতে তার মুখে করুণ একটু হাসি ফুটে উঠতে থাকে।

সমস্ত আবহাওয়ায় ঘন বিষাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটার জন্য গভীর সহানুভূতি বোধ করতে থাকেন মল্লিনাথ। নিজের অজান্তে কখন যে মণিকার হাত নিজের করতলে তুলে নিয়েছিলেন, খেয়াল নেই। হাতটা ধরে তিনি সেইভাবেই বসে থাকেন।

রাত ক্রমশ বাড়তে থাকে। বম্বে শহর কখনও ঘুমোয় না। তবে পেছনের রাস্তায় গাড়ির চলাচল কমে এসেছে। জুহু বীচে ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। ভেলপুরি বাটাটাপুরি ইডলি দোসার দোকানগুলিতে একে একে আলো নিভতে থাকে।

একসময় মণিকা বলে, 'অনেক রাত হল, আপনার ডিনারের সময় হয়েছে। খাওয়ার ব্যবস্থা করি।'

মল্লিনাথ বলেন, 'পরে খাব। আরেকটু বসো।'

'না। দেরি করে খেলে আপনার শরীর খারাপ হবে।'

আস্তে আস্তে মল্লিনাথের হাতের ভেতর থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যালকনি থেকে ঘরে চলে যায় মণিকা। একটু পর চারটে ট্যাবলেট এবং এক গেলাস জল এনে বলে, 'ওষুধগুলো খেয়ে নিন।'

মণিকাকে যত দেখছেন, বিস্ময় ততই বাড়ছে মল্লিনাথের। বলেন, 'আমি যে রাতে এই চার রকমের ওষুধ খাই, তুমি জানলে কী করে?'

মণিকা বলে, 'অবিনাশবাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। একটু পর ড্রিংকস দিয়ে যাচ্ছি।' বলে স্নিগ্ধ হেসে ফের ঘরে চলে যায়।

আধ ঘন্টা বাদে ডিনার খেতে বসে বিস্ময়টা আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায় মল্লিনাথের। তাঁর সামনে এখন সাজানো রয়েছে ঘি-ভাত, লুচি, চিতলের পেটি, দই-ইলিশ, শুকনো করে রাঁধা মুরগির মাংস, আলুর দম, স্যালাড, চাটনি এবং সন্দেশ।

বিস্মিত মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি অন্তর্যামী?'

মণিকা উত্তর দেয় না। একপলক মল্লিনাথের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে শুধু।

মল্লিনাথ এবার বলেন, 'আমি যে এসব খেতে ভালবাসি, এ খবরটা তোমায় কে দিলে?'

মণিকা বলে, 'তখন বললাম না, এখানে আসার আগে আপনার সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। মাসখানেক আগে একটা উইকলি কাগজে আপনার একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছিল। কী

খেতে ভালবাসেন, কখন ঘুমোন, কতক্ষণ কাজ করেন—ওই কাগজের রিপোর্টারটিকে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। ইন্টারভিউটা আমি পড়েছি।'

'আর সেসব মনে করে রেখেছ!'

মণিকা নিঃশব্দে হাসে শুধু, কিছু বলে না।

মল্লিনাথ মজা করে বলেন, 'তার মানে আমার ওপর রীতিমত রীসার্চ করেই এসেছ!'

মণিকাও কিঞ্চিৎ তরল গলায় বলে, 'তা তো একটু করতেই হয়েছে। এত বড় একটা মানুষের সঙ্গে কয়েকদিন কাটাতে হবে। তাঁর অভ্যাস পছন্দ-অপছন্দ না জানলে চলে?'

একটু চুপচাপ। রেকর্ডে এখন রবিশংকরের সেতার বেজে যাচ্ছে। তার ঝঙ্কার জুহু বীচের গেস্ট হাউসের একটি ঘরে অলৌকিক স্বপ্নের মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মল্লিনাথ খানিক ভেবে সাজানো খাবারগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'এগুলো নিশ্চয়ই তুমি রেঁধেছ?'

'শুধু সন্দেশটা বাদে।' মণিকা বলে, 'সব কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে। এবার শুরু করুন।'

'তুমিও বসে যাও।'

'আপনার খাওয়া হলে আমি খাব।'

'উঁহু, একসঙ্গে।' মল্লিনাথ বলেন, 'সবই তো হাতের কাছে রয়েছে। দরকার মতো আমি তুলে নিতে পারব। দাঁড়িয়ে কেন? বসে পড়ো।'

অগত্যা মুখোমুখি বসতেই হয় মণিকাকে। খেতে খেতে মল্লিনাথ কত বার যে খাদ্যবস্তুগুলির তারিফ করেন তার ঠিক নেই। বলেন, 'তুমি যা রাঁধো, জানতে পারলে ফাইভ-স্টার হোটেলওলারা তোমাকে লুফে নেবে।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'আমার কথা শুনে তাই মনে হল?'

মণিকা চুপ করে থাকে।

মল্লিনাথ এবার বলেন, 'কার লেখায় যেন পড়েছিলাম, হৃদয়ে প্রবেশ করার সোজা রাস্তা চলে গেছে সুস্বাদু খাবারের ভেতর

দিয়ে। তুমি বোধহয় আমাকে জাদুই করে ফেললে মণিকা।' দু'পেগ হুইস্কি, প্রিয় সব সুখাদ্য এবং মুখোমুখি বসে থাকা বাঞ্ছিত এক নারী—সমস্ত মিলিয়ে মল্লিনাথের মতো একজন ধীর স্থির সংযত মানুষও রীতিমতো প্রগলভ হয়ে পড়েছেন।

মণিকা জানে, এ জাতীয় মানুষের সামনে মাত্রাছাড়া উচ্ছ্বাস দেখাতে নেই। নেশার ঘোরে, আবেগের মাথায় মল্লিনাথ যা বলছেন, কালই হয়ত তা ভুলে যাবেন। এমন কথা আরো অনেকেই তাকে বলেছে। প্রথম দর্শনেই তার কাছে ঘাড় মুচড়ে পড়েছে, এমন লোকের অভাব নেই। কিন্তু ঘোর কেটে যাবার পর তার সঙ্গে কেউ কোনো সম্পর্ক রাখে নি। মল্লিনাথের মতো মানুষের চিরস্থায়ী অনুগ্রহ পেলে সমস্ত জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু তার সম্বন্ধে মল্লিনাথের আন্তরিকতা কতটুকু, তিন চার ঘণ্টার আলাপে তা কি বোঝা যায়? কয়েকদিন সতর্কভাবে মানুষটিকে লক্ষ্য করতে হবে। মণিকা মৃদু গলায় বলে, 'আমাকে যে আপনার ভাল লেগেছে, সেটা আমার সৌভাগ্য।'

খাওয়ার পর নিজের হাতে মল্লিনাথের গা থেকে গাউন এবং পা থেকে স্লিপার খুলে দেয় মণিকা। বলে, 'এবার শুয়ে পড়বেন।'

মল্লিনাথ বলেন, 'চল না, ব্যালকনিতে গিয়ে আরেকটু গল্প করি।'

'না। এগারটা বেজে গেছে।'

হঠাৎ অনুরাধার কথা মনে পড়ে যায় মল্লিনাথের। বেশিরভাগ দিন তো তাঁর সঙ্গে দেখাই হয় না। কচিৎ কখনও বাড়িতে থাকলে তাঁর খাওয়া হয়েছে কিনা, একবার খোঁজও নেন না। তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ার অভ্যাস মল্লিনাথের। কিন্তু কোনো কোনোদিন অফিসের এত সব কাজ থাকে যে বাড়িতে ফাইল নিয়ে আসতে হয়। সেসব দেখে রিমার্ক দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে যায়। কখনও তাঁর ঘরে উঁকি দিয়ে অনুরাধা বলেন না, 'কাগজপত্র রেখে এবার শুয়ে পড়।'

অনুরাধার ভাবনাটা মাথার ভেতর কাজ করে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু পলকহীন তিনি মণিকার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর কী এক প্রতিক্রিয়া যেন

ঘটে যায়। এক হাতে মণিকাকে কাছে টেনে আরেক হাত দিয়ে তার চিবুকটি তুলে ধরে গাঢ় আবেগে চুমু খান। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরেই বিছানায় নিয়ে যান।

পাশাপাশি শুয়ে আরো ঘন করে বুকের ভেতর মণিকাকে মিশিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'তোমার তুলনা নেই।'

মণিকা বলে, 'এভাবে বলবেন না। আপনি তো জানেন, সোসাইটির কোন নরকে আমার জায়গা।'

'প্লিজ ওসব কথা বলো না।' মল্লিনাথ বলতে থাকেন, 'তোমার মতো এত যত্ন আমার মা ছাড়া আগে আর আমাকে কেউ করে নি।'

চাপা আধফোটা গলায় মণিকা বলে, 'আপনার স্ত্রী?'

চমকে ওঠেন মল্লিনাথ। বলেন, 'তার কথা থাক।'

'তিনি একজন দেবী। কাগজে তাঁর খবর কত পড়ি! এত শ্রদ্ধা হয় যে বলে বোঝাতে পারব না।'

'তোমার আর আমার মাঝখানে এখন আমি আর কাউকে চাই না।'

মণিকা একটু চুপ করে থাকে। আন্দাজ করে নেয়, স্ত্রীর সঙ্গে মল্লিনাথের সম্পর্কের ভেতর কোথাও একটা কাঁটা বিঁধে আছে। তা নিয়ে নাড়াচাড়া করা তার সাজে না। বোম্বাই ভ্রমণের পর যে মানুষের সঙ্গে হয়ত আর যোগাযোগ থাকবে না তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতূহল প্রকাশের মানে হয় না। সে বলে, 'আপনার যা ইচ্ছে—'

মণিকার বুকের ভেতর মুখ রেখে মল্লিনাথের মনে হয়, তাঁর বয়স অনেক কমে গেছে। নতুন প্রেমিকের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বলেন, 'আপনি করে নয়, তুমি বল—'

'তাই কি পারি? আপনি আমার চেয়ে সব দিক থেকে কত বড়, কত—'

মণিকাকে থামিয়ে দিয়ে নিজের মুখ তার মুখে ঘষতে ঘষতে মল্লিনাথ বলেন, 'কোনো কথা শুনব না। তুমি বল, তুমি বল, তুমি বল—'

অনেক রাতে মল্লিনাথের কাঁধের খাঁজে মুখ লুকিয়ে হাওয়ার মতো প্রায় নিঃশব্দে ফিস ফিস করে মণিকা, 'তুমি একটা পাগল।'

রোজ ভোরে সূর্যোদয়ের আগে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির অভ্যাস মল্লিনাথের। মণিকাকে নিয়ে পরদিন তিনি জুহু বীচে চলে আসেন।

মণিকা অবশ্য আসতে চায়নি। সতর্কভাবে বলেছে, 'বীচে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? চেনাজানা কেউ তোমাকে যদি আমার সঙ্গে দেখে ফেলে!'

মল্লিনাথ বলেন, 'এত ভোরে আমাদের জন্যে কে আর বীচে ওত পেতে বসে আছে!'

মল্লিনাথ জানেন না, সত্যিই সেই সাংবাদিকটি—তরুণ দত্ত—আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, স্নায়ুগুলো টান টান রেখে গেস্ট হাউসের সুইমিং পুলের ধারে ক্যামেরায় টেলিফোটো লেন্স লাগিয়ে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। মল্লিনাথ আর মণিকা বীচের দিকে যেতেই সে-ও নিঃশব্দে তাদের পিছু নেয়।

বীচে এসে কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করে হাঁটেন মল্লিনাথরা। আজ প্রচুর হাওয়া দিয়েছে। দু'জনের চুল এবং পোশাক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর টাট্টুতে চড়ে আরো খানিকটা সময় ঘুরে বেড়ান তাঁরা। তারপর বেলা সামান্য চড়লে বীচে যখন ভিড় বাড়ে, গেস্ট হাউসে ফিরে আসেন।

মল্লিনাথকে রেস্ট নিতে বলে দ্রুত চা করে নিয়ে আসে মণিকা। মল্লিনাথ হেসে হেসে বলেন, 'সব কিছুই তো নিজের হাতে করছ। গেস্ট হাউসকে একটু সেবা করার সুযোগ দাও।'

মণিকা বলে, 'আমি যতদিন আছি, তোমার সব কিছুই আমি করব।'

ওদের চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই ম্যাসাজ করার জন্য একটি লোক এসে হাজির। মণিকা বলে, 'যাও, ম্যাসাজ করিয়ে স্নান সেরে এসো। আমি ততক্ষণ ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে ফেলি।'

মল্লিনাথ বলেন, 'ম্যাসাজেরও বন্দোবস্ত করে রেখেছ!'

'বা রে, এতদিনের হ্যাবিট। হঠাৎ বন্ধ থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে না? তাই এখানে এসেই অবিনাশবাবুকে দিয়ে ম্যাসিওর ঠিক করে ফেলেছি।'

মল্লিনাথ অভিভূত হয়ে যান। যে যত্ন যে পরিচর্যা তিনি এই পয়সা দিয়ে কেনা মেয়েটির কাছে পাচ্ছেন তার কোটি ভাগের এক ভাগও নিজের স্ত্রীর কাছে পান নি।

মল্লিনাথ বলেন, 'খুব খারাপ অভ্যেস করে দিচ্ছ। এর পর তোমার ওপর ডিপেণ্ড করা ছাড়া আমার আর গতি থাকবে না।'

মণিকা হাসে শুধু।

সাত

বম্বেতে এবার একটা সপ্তাহ থাকতে হল মল্লিনাথকে। এখানে তাঁর দৈনন্দিন রুটিনটা এইরকম। সমস্ত দিন কোম্পানির নানা সমস্যা নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপর সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে জুহুর সেই গেস্ট হাউসটা অদৃশ্য চুম্বকের মতো তাঁকে টানতে থাকে। রাতটা মণিকার কাছে কাটিয়ে পরদিন সকালে স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে তিনি প্রথমে যান হোটেল স্কাইলাইন-এ, সেখান থেকে অফিসে।

এই সাত দিনে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ায় জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর যে সব সমস্যা ছিল, মিটিয়ে দিয়েছেন মল্লিনাথ। কারখানাগুলোর এক্সপ্যানসানের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছেন। ব্যাক-বে রিক্লেমেসানের প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট ঘুরে এমপ্লয়ীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন। অর্থাৎ অন্যান্য বার বম্বে এলে যা যা করেন, এবারও তা-ই করেছেন। ডোনা-ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে তাঁরা লোনিতে যে ফ্যাক্টরিটা বসাতে যাচ্ছেন, এর মধ্যে একদিন সকালে সেখানে গিয়ে সাইট দেখে বিকেলেই ফিরে এসেছেন। তবে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর যে প্রোডাকসান ইউনিটগুলো এ অঞ্চলে রয়েছে, সেখানে আর যাওয়া হয়নি। অবশ্য বম্বেতে এলে প্রতিবারই যে কারখানাগুলো দেখতে যান, এমন নয়। দেড় দু'বছর পর পর হয়ত একবার দেখে আসেন।

কাজকর্ম মসৃণ নিয়মেই করে গেছেন মল্লিনাথ। এবার ব্যতিক্রম যেটুকু ঘটেছে তা এইরকম। অন্যান্য বার এলে সারাদিন পর

হোটেলে বা কোম্পানির গেস্ট হাউসে চলে এসেছেন। সঙ্গে কেলকার এবং অন্য বড় অফিসাররা থাকেন। প্রায় রোজই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পলিসি ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত কনফারেন্স করেছেন। মল্লিনাথের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তাঁরা ফিরে গেছেন।

এবার সূর্যাস্তের পর মল্লিনাথকে এক মিনিটের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে কেলকারদের মনে প্রচণ্ড কৌতূহল এবং খানিকটা টেনশানও রয়েছে কিন্তু মল্লিনাথকে কোনো প্রশ্ন করতে কারো সাহস হয়নি।

এ ক'দিনে বম্বের নানা চেম্বার অফ কমার্স থেকে তো বটেই, অন্য বন্ধুরাও লাঞ্চ বা ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন। লাঞ্চে গেছেন মল্লিনাথ কিন্তু সবিনয়ে ডিনারে যাবার অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছেন।

ওদিকে টেলিফোন অপারেটরদের কাছ থেকে জানা গেছে, প্রতিদিন নানা ধরনের মানুষ তাঁর খোঁজ করছে। বিজনেসম্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো ভি.আই.পি, ইকোনমিস্ট, ট্রেড বা ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত নানা জার্নালের সম্পাদক, ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশি বার ফোন করেছে সুকুমার সান্যাল। এদের সকলের নাম এবং ফোন নাম্বার নোট করে নিয়েছে টেলিফোন অপারেটররা। সুকুমার ছাড়া বাকি প্রায় সবার সঙ্গে ফোন করে কথা বলে নিয়েছেন মল্লিনাথ। এঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সঙ্গে গল্পটল্প করার জন্য দেখা করতে চেয়েছেন, তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, এবারটা তিনি খুবই ঝামেলায় আছেন, খুব শীগগিরই ত আবার এ শহরে আসছেন, তখন নিজে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। সুকুমার এবং প্রেসের লোকজন সম্পর্কে টেলিফোন অপারেটরদের পরিষ্কার একটাই নির্দেশ দেওয়া আছে মল্লিনাথের। যখনই ওরা ফোন করুক না, বলতে হবে তিনি হোটেলে নেই, কখন তাঁকে পাওয়া যাবে জানানো সম্ভব নয়। অবশ্য মনে মনে মল্লিনাথ ঠিকই করে রেখেছেন কলকাতায় ফিরে সুকুমারকে ডাকিয়ে এনে ইন্টারভিউর বাকি অংশটা কমপ্লীট করে দেবেন।

আজ বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে যাবেন মল্লিনাথ। আর সন্ধের ট্রেন ধরে অবিনাশের সঙ্গে ফিরবে মণিকা।

এখন, এই ভোরবেলায় জুহু বীচে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলেন মল্লিনাথ আর মণিকা।

রোদ ওঠে নি, মিহি সিল্কের মতো কুয়াশায় আরেবিয়ান সী ঝাপসা হয়ে আছে। সাগরপাখিরা অলস ডানায় ভর করে পাড়ের কাছে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বীচে ভিড়টিড় তেমন নেই। সমুদ্রের হাওয়া থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সংগ্রহকারীরা এখনও দল বেঁধে হানা দিতে শুরু করে নি। সমস্ত আবহাওয়া জুড়ে অগাধ প্রশান্তি আর পবিত্রতা।

মল্লিনাথ বলেন, 'সাতটা দিন স্বপ্নের মতো কেটে গেল।'

মণিকা আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার সঙ্গে কিভাবে দেখা হবে বল?' গভীর আগ্রহে মণিকার দিকে তাকান মল্লিনাথ।

সমুদ্রের দিকে মুখ করে হাঁটছিল মণিকা। চোখ না ফিরিয়ে দূরমনস্কর মতো সে বলে, 'আর দেখা না হওয়াই তো ভাল।'

মল্লিনাথ চমকে ওঠেন, 'কী বলছ মণিকা! তোমাকে ছাড়া এরপর জীবনটা মনে হয় মিনিংলেস হয়ে যাবে।'

মণিকা একটু হাসে, বলে, 'এটা কিন্তু একেবারে কাঁচা প্রেমিকদের মতো কথা হল। দেশের একজন টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মুখে কিন্তু এই সংলাপ মানায় না।'

'মানাক বা না মানাক, আমি যা বলেছি ভেবেচিন্তেই বলেছি। প্রেমে পড়লে যে যুবকেরা প্রলাপ বকে, আমি অন্তত তাদের বয়েসটা পেরিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার মতো বাজে তুচ্ছ মেয়ের জন্যে তোমার এত অস্থির হওয়া ঠিক না।'

'তুচ্ছ, তুচ্ছ, তুচ্ছ—' স্বাভাবিক সংযম এবং গাম্ভীর্য হারিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়েই ওঠেন মল্লিনাথ, 'এই কথাটা তোমার মুখে অনেক বার শুনেছি। প্লিজ স্টপ ইট।'

মণিকা বিষণ্ণ হাসে, বলে, 'ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু কথাটা তো আর মিথ্যে নয়।

একটু চুপচাপ।

তারপর মল্লিনাথ গাঢ় গলায় বলেন, 'জানো মণিকা, একটি পুরুষের জীবনে নারীর মহিমা কতটুকু এই সাত দিনে প্রথম বুঝতে পারলাম।'

মণিকার বুকের ভেতরটা আলোড়িত হয়ে যায়। দেহ এবং মনকে খোলাবাজারে কসমেটিক গুডস বা ভোগ্য পণ্যের মতো এতকাল বেচে এসেছে মণিকা। কিন্তু মল্লিনাথের মতো আর কেউ এভাবে তার নারীত্বকে মর্যাদা দিয়ে কথা বলে নি। এর আগে যারা টাকা দিয়ে তাকে কয়েক দিনের জন্য কিনেছে, শারীরিক সুখটুকু ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা উসুল করে ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাদের কাছে সেন্টিমেন্ট, আবেগ, আন্তরিকতা, নারীত্ব, এসবের দাম কানাকড়িও না। কিন্তু মল্লিনাথের আকুলতা তাঁর অস্তিত্বে ঢেউ তুললেও নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট। সে জানে কলকাতা থেকে বার তের শ মাইল দূরে এই গেস্ট হাউসের নির্জন স্যুইটে মল্লিনাথের পক্ষে যা বলা সম্ভব, কলকাতায় ফিরে গিয়ে তা মুখে আনার কথা ভাবা যায় না। সেখানে আছে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অজস্র পরিচিত মানুষ, তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সবার উপরে তাঁর স্ত্রী। সবাই মিলে তাঁর কন্ঠস্বর বন্ধ করে দেবে। তা ছাড়া মণিকা তাঁর পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের জীবনে অনেক কিছু দেখেছে। তার অভিজ্ঞতার প্রায় সবটুকু তিক্ত। এই পৃথিবীতে হৃদয়হীন মানুষের সংখ্যাই বেশি। কারো স্তুতি বা চাটুকারিতা শুনে ভাবাবেগে ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে বেড়াবার বয়েস কবেই পেরিয়ে এসেছে মণিকা। পৃথিবীর মাটিতে তার পা শক্ত করে আটকানো। নিজের সীমারেখা সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার। সে বলে, 'কিন্তু তুমি নিজের স্ত্রীর প্রতি অবিচার করছ। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানি তাতে মনে হয় তিনি দেবীর মতো।'

'হ্যাঁ, দেবী—দেবী—দেবী। এই কথাটা তুমি আগেও বলেছ। কিন্তু সে মানবী নয়। সে যাক, তোমার কি টেলিফোন আছে?'

'আছে। কেন?

'আমাকে নাম্বারটা দিও। আমার বেডরুমে একটা সিক্রেট ফোন আছে। ডাইরেক্টরিতে সেটার নাম্বার পাবে না। তোমাকে সেই নাম্বারটা দেবো, রাত দশটার পর ডায়াল করলে আমাকে পেয়ে যাবে।'

মণিকা উত্তর দেয় না।

মল্লিনাথ বলে, 'কী হল? চুপ করে রইল যে?'

মণিকা আস্তে আস্তে এবার যা বলে তা এইরকম। বম্বে হল দূরের শহর, এখানে খুব বেশি লোকজন মল্লিনাথকে চেনে না। কিন্তু কলকাতা তাঁর নিজের জায়গা। তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গেলে সেটা প্রচন্ড ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। মল্লিনাথের মতো এত বড় একটা মানুষের দুর্নাম রটে গেলে আপসোস আর গ্লানির শেষ থাকবে না মণিকার। সে বলে, 'কলকাতায় আমাদের দেখা না হওয়াই ভালো। তুমি যখন আবার বাইরে কোথাও যাবে, অবিনাশবাবুকে দিয়ে খবর দিও।'

'তার মানে কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না?' মল্লিনাথের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ ফুটে ওঠে।

মণিকা স্থির চোখে মল্লিনাথের দিকে তাকায়। এই বিখ্যাত মানুষটি তাকে ভালবেসে ফেলেছেন, টের পেতে এখন আর অসুবিধা হয় না।

ভালবাসা খুব দুর্লভ জিনিস, বিশেষ করে তাদের মতো মেয়েদের কাছে। একটা সুন্দর উত্তেজক শরীরের জন্য টাকাপয়সা, বা সুখস্বাচ্ছন্দের অভাব নেই তার। ব্যাঙ্কে এর মধ্যেই যা জমেছে, কোনো মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভও রিটায়ার-মেন্টের পর তা চিন্তা করতে পারে না। সে একটা আঙুল নাড়লে পোকার মতো আজও মানুষ ছুটে আসে কিন্তু মণিকা জানে, যাবা তার চারপাশে ভিড় জমায় তারা পয়সাওলা লম্পটের দল। রোবটের মতো যান্ত্রিক নিয়মে সে শুধু তাদের বিছানায় রাতের পর রাত সঙ্গ দিয়ে যায়। এটাকেই মণিকা এতকাল নিয়তি বলে ভেবেছে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম এমন একটি পুরুষকে সে পেয়েছে যাঁর জন্য সর্বস্ব বাজি ধরা যায়। মল্লিনাথের মতো

মানুষ সে আগে আর দেখে নি। অন্য মেয়ে হলে তাঁকে ছাড়ত না। সারা জীবন মতো সাঁড়াশির মতো ধরে রাখত। কিন্তু মণিকার মধ্যে এক ধরনের সততা আছে। তাছাড়া সে জানে দেশের সেরা একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ঠুনকো, সেটা স্থায়ী হওয়া সম্ভব না। মণিকা বলে, 'অবুঝ হয়ে লাভ নেই। তুমি সোসাইটির কোন লেভেলে আছ আর আমি কোথায়, সেটা ভুলে যেও না। তোমার সঙ্গে আমার আকাশ-পাতাল তফাত। তোমার যা মর্যাদা তা একদিনে হয় নি। সমস্ত জীবন ধরে একটু একটু করে ওটা তৈরি করতে হয়েছে।' গভীর আন্তরিক গলায় সে বলে যায়, 'একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।'

মল্লিনাথ বলেন, 'কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি যে অনেক কিছু ভেবে রেখেছি মণিকা।'

'কী ভেবেছ?'

'সেটা কলকাতায় গিয়ে বলব।'

'আমাকে সেখানে তুমি পাচ্ছ কোথায়?' বলে মণিকা নিঃশব্দে হাসে।

মল্লিনাথও হাসেন। বলেন, 'তোমাকে খুঁজে বার করা কি অসম্ভব ব্যাপার?'

একটু ভেবে মণিকা বলে, 'ও, বুঝেছি। অবিনাশবাবু তো তোমার লোক।'

'তোমারও।'

'সে যাই হোক,' হাল ছেড়ে দেবার মতো করে মণিকা বলে, 'জানি না, কলকাতায় ফিরে তুমি কী করে বসবে। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী অনুরোধ?'

'নিজের সম্মান, মর্যাদা নষ্ট হয়—এমন কোনো রিস্ক নিও না।'

'তোমার কথা মনে রাখতে চেষ্টা করব।'

আট

সেদিনই কলকাতায় ফিরেছিলেন মল্লিনাথ। গিয়েছিলেন ট্রেনে, ফিরলেন প্লেনে। বম্বে থেকে টেলেক্সে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল। বাড়ি থেকে শোফার গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে, আশ্চর্য, প্রথমেই কিন্তু যাঁর কথা মনে পড়ল সে মণিকা নয়, জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর কোনো সমস্যাও নয়—তিনি তাঁর স্ত্রী অনুরাধা। ম্যাগসেসে প্রাইজের জন্য বম্বে থেকে স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলেক্স পাঠানোর কথাটা শেষ পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। ড্রোনা ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে নতুন ভেনচার, বম্বে অফিসের নানা কাজকর্ম আর বিশেষ করে মণিকা—এসব নিয়ে ঠাসা প্রোগ্রামের মধ্যে তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে অন্য কোনো কিছু ভাবার সময় পান নি।

শোফারটির নাম কিষণলাল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ইস্টার্ন বাই পাস ধরে মসৃণ গতিতে যেতে যেতে মল্লিনাথ ডাকেন, 'কিষণলাল—'

চোখ সামনে রেখে কিষণলাল সাড়া দেয়, 'জি সাব—'

'তোমাদের মেমসাহেব কি কলকাতায় আছেন?'

'নেহী সাব। দিল্লী গয়ী।'

'কবে গেছেন?'

'তিন রোজ আগে।'

কিষণলাল মানুষটা খুবই স্বল্পভাষী। কোনো ব্যাপারেই তার অযথা কৌতূহল নেই। উপযাচক হয়ে বাড়তি কথা বলে না। যে প্রশ্ন করা হয় শুধু তারই সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু পাওয়া যায়। তার বেশি একটি শব্দও তার মুখ থেকে বেরুবে না। মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কবে ফিরবেন জানো?'

কিষণলাল বলে, 'দশ রোজ বাদ আমাকে গাড়ি নিয়ে এয়ার-পোর্ট যেতে বলেছেন।'

তার মানে অভিনন্দনটা এখন থেকে দশদিনের জন্য মুলতুবি রাখতে হবে। মল্লিনাথ আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

বম্বে থেকে ফেরার পর চার দিন কেটে গেছে। মল্লিনাথ যেদিন ফিরেছেন তার একদিন বাদেই অবিনাশ আর মণিকার কলকাতায় পৌঁছুনোর কথা। তিনি আশা করেছিলেন, কলকাতায় এসেই মণিকা তাঁকে ফোন করবে, কিন্তু করে নি।

তাঁর সম্বন্ধে মণিকার আগ্রহ কতটা, বোঝার জন্য আরো দুটো দিন অপেক্ষা করেছেন মল্লিনাথ। অফিসে যাওয়া, রুটিন অনুযায়ী রোবোটের মতো খাটা—সবই করে গেছেন যেন নিখুঁত যান্ত্রিক নিয়মে। কিন্তু এতকালের অভ্যস্ত জীবনযাপনের মধ্যে মেয়েটা ঝড় তুলে দিয়েছে। সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও বার বার তার মুখটা মনে পড়েছে মল্লিনাথের। যতক্ষণ অফিসে, ক্লাবে বা চেম্বার অফ কমার্সের কোনো মিটিংয়ে থেকেছেন, একরকম কেটে গেছে কিন্তু বাড়ি ফেরার পর সময় একেবারে অনড়। চাপ চাপ বরফের মতো নিঃসঙ্গতা তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ওপর চেপে বসেছে। আর তখন বড় বেশি মনে পড়েছে মণিকাকে।

এতকাল তবু একরকম ছিল কিন্তু মণিকার সঙ্গে একটা সপ্তাহ বম্বেতে কাটিয়ে আসার পর মনে হচ্ছে, মেয়েটা তাঁর জীবনে বড়ই জরুরি। তাকে বাদ দিয়ে এখন আর কিছু ভাবা যায় না। নারীসঙ্গ তিনি তো কম করেন নি কিন্তু একটা মেয়ে যে এতটা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল? মণিকা যেন তাঁর চারপাশে আন্তরিকতা, মাধুর্য, সেবা এবং পরম সুখকর সঙ্গ দিয়ে একটি স্বপ্নের বলয় গড়ে দিয়েছে। সেই স্বপ্নটা অনেক রাত পর্যন্ত তাঁকে ঘুমোতে দেয় না।

আশ্চর্য, অবিনাশও বম্বে থেকে ফেরার পর দেখা তো করেই নি, এখন কি ফোন পর্যন্ত করে নি। অবশ্য সে এমনিতে বড় একটা আসে টাসে না। যখন সঙ্গিনীর দরকার হয়, তখনই তার দর্শন পাওয়া যায়। সে এর মধ্যে এলে মণিকার খবরটা পাওয়া যেত।

আজ ডিনারের পর মল্লিনাথ বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করেন। মাথার কাছেই একটা ছোট টেবলে তিন চারটে টেলিফোন রয়েছে। একটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে থাকেন।

একটু পর ওধার থেকে সেই পরিচিত, অতি সুরেলা, দানাওলা কণ্ঠস্বরটি ভেসে আসে, 'হ্যালো, কে বলছেন ?'

'গলা শুনে চিনতে পারলে না ?'

একটু চুপ করে থেকে মণিকা বলে, 'বুঝেছি।'

'দু'দিন আগে ফিরেছ, ফোন কর নি কেন ?'

'ইচ্ছে করেই। অবিনাশবাবু কাল এসেছিলেন, আপনাকে ফোন করতে বললেন। আমি বললাম, থাক।'

এ রকম উত্তর আশা করেন নি মল্লিনাথ। বলেন, 'কারণটা কী ?'

'আমি একটু ওয়েট করতে চেয়েছিলাম।'

'কেন ?'

মণিকা বলে, 'দেখছিলাম দেশের একজন সেরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের নেশা বম্বে থেকে ফেরার পরই ছুটে গেছে কিনা।'

মল্লিনাথ চমকে ওঠেন, 'কী বলছ তুমি! রোজ ভাবি কখন তোমার ফোন আসে। তোমার গলা শোনার জন্যে কত রাত পর্যন্ত জেগে থাকি, তা কি জানো !'

মণিকা মজার ভঙ্গিতে কন্ঠস্বরে একটু টান দিয়ে বলে, 'যাক, নেশা তা হলে কাটে নি।'

'ঠাট্টা নয়। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। আমার ভীষণ ইচ্ছে, কাল দেখা হোক।' মল্লিনাথের গলায় ব্যাকুলতা ফুটে বেরোয়।

'কতদিন কোথায় ? মোটে তো দুটো দিন।'

'আমার কাছে দুটো বছর মনে হচ্ছে।'

গভীর গলায় মণিকা বলে, 'এখনও ভেবে দেখ, কলকাতায় আমাদের দেখা হওয়াটা ঠিক হবে কিনা। শুধু শুধু নতুন প্রবলেম ডেকে এনে কী লাভ ?'

মল্লিনাথ বলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। যদি প্রবলেম দেখা দেয় সেটা ফেস করায় শক্তি আমার আছে।' একটু থেমে গাঢ় আবেগের গলায় বলেন, 'তোমাকে বাদ দিয়ে এখন আর নিজেকে ভাবতে পারি না।'

মণিকা উত্তর দেয় না।

মল্লিনাথ অসহিষ্ণুভাবে এবার বলেন, 'কী হল, চুপ করে আছ কেন? কাল তোমাকে দেখতে চাই।'

মণিকা মৃদু গলায় বলে, 'কাল কোথায়, কিভাবে দেখা হবে?'

একটু ভেবে মল্লিনাথ বলেন, 'কাল রাত আটটায় অবিনাশকে নিয়ে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের উল্টোদিকে গাড়িতে ওয়েট করবে। ভাল গাড়ি ভাড়া করতে বলবে অবিনাশকে। ও নিজেই যেন ড্রাইভ করে নিয়ে আসে।'

'আচ্ছা।'

পরদিন কাঁটার কাঁটায় আটটায় বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে এসে তাঁর দামী লিমুজিন থেকে নামেন মল্লিনাথ। শোফারকে বলেন, 'তুমি ঠিক দশটায় এখানে চলে আসবে। আমি যতক্ষণ না ফিরছি, ওয়েট করবে।'

'জি, সাব—' শোফার গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

মল্লিনাথ জানেন, রাস্তার উল্টোদিকে কোথাও মণিকাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে অবিনাশ। বিশ্বাসী, সময়ানুবর্তী অবিনাশের কথার বিন্দুমাত্র নড়চড় হয় না। রাস্তা পার হওয়ার আগেই আলাদিনের জিনের মতো মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়ায় অবিনাশ। সসম্ভ্রমে বলে, 'আসুন স্যর—'

'কতক্ষণ এসেছ?'

'মিনিট পাঁচেক।'

সত্যিই চমৎকার ঝকঝকে একটা ফোরেন কার-এর ব্যবস্থা করেছে অবিনাশ। গাড়িটা উল্টোদিকে ফুটপাথ ঘেঁষে পার্ক করা আছে। জানালার নীলাভ কাচ কয়েক ইঞ্চি ফাঁক রেখে পুরোটাই প্রায় এমনভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। তবে ভেতর থেকে বাইরের লোকজন, গাড়িটাড়ি বা অন্য দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে।

গাড়িটার কাছে এসে অবিনাশ বলে, 'স্যর, আপনি উঠুন। মণিকা ভেতরে আছে।' বলে দরজা খোলার জন্য হাতলের পুশ বটামে হাত রাখে।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় মল্লিনাথের। গলা নামিয়ে বলেন,

'মণিকা ছাড়া আর কেউ আছে—মানে শোফার টোফার?' তাঁর কন্ঠস্বরে কিছুটা উদ্বেগ ফুটে বেরোয়।

'না না, আমি নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি। সাক্ষী রেখে লাভ কী? পরে ট্রাবল হতে পারে।'

দূরদর্শী, অতীব তৎপর অবিনাশের কাজে কোথাও ফাঁক থাকে না। দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে মল্লিনাথ বলেন, 'ভেরি গুড।'

অবিনাশ বলে, 'স্যর, আমি কোথায় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব?'

'মানে?' একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন মল্লিনাথ।

অবিনাশ বুঝিয়ে দেয়, মণিকাকে নিয়ে তো আর নিজের বাড়িতে তুলতে পারবেন না মল্লিনাথ। কিছুক্ষণ বেড়াবার পর যার যার জায়গায় তাঁদের ফিরে যেতে হবে। অবিনাশ মণিকাকে তার নর্থ ক্যালকাটার ফ্ল্যাটে পেঁছে দেবে। তাই তার জানা দরকার কোথায়, কতক্ষণ বাদে মল্লিনাথ মণিকাকে তার হাতে তুলে দেবেন।

মল্লিনাথ বলেন, 'ঠিক দশটায় তুমি এখানে চলে আসবে।'

'আচ্ছা স্যর।' অবিনাশ পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মল্লিনাথ গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখেন ব্যাকসীটে বসে আছে মণিকা। বলেন, 'সামনে এসো।'

মণিকা নেমে ফ্রন্ট সীটে চলে আসে। তার পাসে শোফারের সীটে বসে স্টার্ট দেন মল্লিনাথ।

মণিকা বলে, 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।'

একটু অসহিষ্ণুভাবে মল্লিনাথ বলেন, 'কেন তোমার এত দ্বিধা? বেশ কিছুদিন তো আমরা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলাম। আমার মধ্যে কোনোরকম আন্তরিকতার অভাব দেখেছ?'

মণিকা চকিত হয়ে ওঠে, 'না না, সে কথা আমি বলছি না।'

'তবে?'

'এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে ঘোরাঘুরি করে কী লাভ? এর তো কোনো পরিণতি নেই।'

মল্লিনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'এই ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

দেশের একজন বিশিষ্ট, বিখ্যাত মানুষের গায়ে তার সংস্পর্শে

কালির ছিটে লাগে, এটা চায় নি মণিকা। সেই বম্বে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মল্লিনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, বারবনিতার সঙ্গে দু-চারদিনের বেশি সম্পর্ক রাখতে নেই। টাকার বদলে সামান্য দেহসুখ, তারপরই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। কিন্তু মল্লিনাথ কোনো কথাই শুনলেন না। এত বড় একজন মানুষ তার জন্য নিজের সামাজিক মর্যাদা, সুনাম, প্রতিষ্ঠা সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এটা মণিকার অহঙ্কার। মাত্র কয়েকটা দিন মল্লিনাথের সঙ্গে কাটিয়েছে সে কিন্তু তারই মধ্যে টের পেয়েছে, বিবাহিত জীবনে চরম অসুখী এই মানুষটি সামান্য একটু মমতা আর স্নেহের জন্য সর্বক্ষণ উন্মুখ হয়ে আছেন। মল্লিনাথের জন্য অসীম সহানুভূতি বোধ করেছে সে, সেই সঙ্গে অনেকখানি উৎকণ্ঠাও। তার ভয়, মল্লিনাথের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। মাত্র কয়েকদিন এক সঙ্গে কাটিয়ে তাঁকে কখন যে ভালবেসে ফেলেছে মণিকা, নিজেই জানে না। তার জীবনটা নরকের পিচ্ছিল অন্ধকার সুড়ঙ্গে কেটে যাচ্ছিল কিন্তু এই মানুষটা আচমকা চন্দ্রকিরণের মতো তাকে অসীম স্নিগ্ধতায় ভরে দিয়েছেন।

নানাভাবে চেষ্টা করেও যখন মল্লিনাথকে ঠেকানো গেল না তখন এটাকে অনিবার্য নিয়তি বলেই মেনে নিল মণিকা। সে বলে, 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা—'

প্রায় দশটা পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন মল্লিনাথ। তিনি যেন দেশের একজন সেরা, অতি বুদ্ধিমান শিল্পপতি নন। বিচিত্র কোনো ম্যাজিকে বয়সটা কুড়ি পঁচিশ বছর কমে গিয়ে তাঁকে প্রথম যৌবনে পেঁছে দেয়। এক হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে, অন্য হাত দিয়ে মণিকার কোমর বেষ্টন করে মুগ্ধ গলায় ফিসফিস করে অনবরত যা তিনি বলে যান, প্রথম প্রেমে-পড়া কোনো কিশোর বা যুবককেই শুধু তা মানায়।

নিজের হাতে খাবার তৈরি করে মল্লিনাথের জন্য টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই করে নিয়ে এসেছিল মণিকা। রাস্তার একধারে, মোটামুটি নির্জন জায়গা দেখে মল্লিনাথকে গাড়ি থামাতে বলে সে।

মল্লিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কেন ?'

'থামাও না।'

গাড়ি থামলে টিফিন ক্যারিয়ার থেকে নানা রকম সুখাদ্য বার করে প্লেটে সাজিয়ে বলে, 'খাও—'

মল্লিনাথ যেমন খুশি তেমনি অবাকও। উচ্ছ্বাসের সুরে বলেন, 'এত খাবার করে এনেছ!'

'এত আবার কোথায়? এই সামান্য—'

'বা রে, আমি একা খাব নাকি! এসো, একসঙ্গে খাওয়া যাক।'

লাজুক ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে মণিকা বলে, 'না না, আমি বাড়ি ফিরে খাব। এগুলো শুধু তোমার জন্যে।'

মল্লিনাথ কোনো কথা শোনেন না, একরকম জোর করে মণিকাকে তাঁর সঙ্গে খাওয়ান।

দশটা নাগাদ প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে এসে ওঁরা দেখেন অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে মল্লিনাথ তাকে বলেন, 'কাল আবার মণিকাকে এখানে নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা স্যর—' অবিনাশ বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি বাড়ি ফিরবেন কী করে?'

'তার ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না অবিনাশ। শুধু বলে, 'গুড নাইট—'

'গুড নাইট—' বলে প্ল্যানেটোরিয়ামের রাস্তা পেরিয়ে উল্টো-দিকে চলে যান। ওখানে তাঁর শোফার লিমুজিন নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে গেছে।

নয়

পাক্ষিক দিনকাল-এর অফিসটা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছকাছি একটা আধ-পুরনো বিরাট ম্যানসনের দোতলায়। হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা জুড়ে সম্পাদকীয় দপ্তর।

অমিতাভ মৈত্র এই পাক্ষিকটির সম্পাদক এবং মালিক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাংবাদিকতা রয়েছে তাঁর রক্তের মধ্যে।

অমিতাভর ঠাকুরদা কলকাতার এক নাম-করা বাংলা ডেইলির নিউজ এডিটর ছিলেন, বাবা ওই কাগজেরই পলিটিক্যাল করেসপনডেন্ট। সাংবাদিকতার উত্তরাধিকার নিয়ে অমিতাভও ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে তাঁর বাবা আর ঠাকুরদার কাগজে ট্রেনী জার্নালিস্ট হিসেবে ঢুকেছিলেন। লেখার হাত, ভাষার ওপর প্রচন্ড দখল, পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা—সব মিলিয়ে ট্রেনী পিরিয়ড এক বছরের জায়গায় তিন মাসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি তাঁকে রিপোর্টার হিসেবে পার্মানেন্ট করে নেয়।

খবরের কাগজে কাজ করলেও বাবা এবং ঠাকুরদার সঙ্গে অমিতাভর অনেকখানি পার্থক্য ছিল। তাঁরা চাকরিটা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সুচারুভাবেই করে গেছেন। সেদিক থেকে চাকরিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না অমিতাভ। কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ভাল কবিতা আর গল্প লিখতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল একটা ভাল সাহিত্যপত্র বার করবেন, যার মডেল হবে বঙ্গদর্শন, প্রবাসী বা সবুজপত্র।

অমিতাভ যখন সীনিয়র রিপোর্টার, চাকরির পাশাপাশি একটা কাগজও বার করে ফেললেন—মাসিক স্বর্ণাক্ষর। কাগজটার এক মলাট থেকে আরেক মলাট পর্যন্ত সুরুচি আর পরিচ্ছন্নতার ছাপ ছিল। যথেষ্ট সুনামও হয়েছিল। কিন্তু চাকরি বজায় রেখে একটা দু'শ পাতার কাগজ নিয়মিত বিশেষ এক স্ট্যান্ডার্ডে বার করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। দুম করে চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন অমিতাভ। এরপর পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হল। ইংরেজি মাসের পয়লা তারিখে তাঁর কাগজ বাজারে চলে আসতে লাগল।

কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে। বিশুদ্ধ সাহিত্যের কাগজ বার করে যেটুকু সুখ্যাতি পাওয়া যায়, পয়সা তার একশ' ভাগের এক ভাগও নয়। আসলে টিভি, ভিডিও, ভিসিআর মানুষের রুচি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। যা কিছু সুন্দর, মহৎ বা শোভন—তার আর বাজার নেই। সস্তা, চটুল, সেক্স-ভায়োলেন্সে ভরা ছবি বা লেখা ছাড়া মানুষ আজকাল অন্য কিছু ছুঁতে চায় না। ফিল্ম দেখেই হোক বা কোনো লেখা পড়েই হোক, প্রতি মুহূর্তে সবাই চায় 'কিক'। উগ্র ঝাঁঝালো মদ খেলে স্নায়ুমন্ডলে যে জাতের

ধাক্কা লাগে, সবাই উন্মাদের মতো তা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এদিকে অমিতাভর ঘরে কোটি কোটি টাকা নেই যে আজীবন মিশনারিদের মতো সৎ সাহিত্য প্রচার করে যাবে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ আর কতদিন তাড়ানো যায়? অগত্যা সাহিত্য পত্রিকার বদলে সাড়ে বত্রিশভাজা সাজিয়ে একখানা কাগজ বার করলেন অমিতাভ। পনের পারসেন্ট সাহিত্য, পঁচিশ পারসেন্ট পলিটিকাল নিউজ, তিরিশ পারসেন্ট সিনেমা, পাঁচ পারসেন্ট টিভি ইত্যাদি মিলিয়ে একটা ককটেল। কিন্তু এই ফরমুলার কাগজ বাজারে ডজন ডজন বেরিয়ে গেছে। কাজেই বিজনেসের দিক থেকে তেমন কিছু হল না।

অমিতাভর একবার মনে হল, কাগজ টাগজ তুলে দিয়ে ফের তাঁর পুরনো পত্রিকায় ফিরে যাবেন। বরাবরই তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে বলেই রেখেছেন, দরজা খোলাই আছে, যখন ইচ্ছা তিনি ফিরে আসতে পারেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশা কাটিয়ে উঠেছেন অমিতাভ। তাঁর মধ্যে একটা দারুণ একগুঁয়ে মানুষ রয়েছে, কোনো কিছুর শেষ না দেখে তিনি ছাড়েন না। দু'বার ঠেকে তিনি ঠিক করলেন, সস্তা রুচিতেই গা ঢেলে দেবেন। জনগণ যা চায় দশ হাতে তার যোগান দিয়ে যাবেন। অর্থাৎ কিনা সেক্স ভায়োলেন্স এবং স্ক্যান্ডালের বান ডাকিয়ে ছাড়বেন। রাতারাতি নতুন ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনের ডিক্লারেসন নিয়ে বাজারে কাগজ ছেড়ে দিলেন। প্রথম ইস্যু ফোর্টনাইটলি 'দেশকাল' লোকের নজরে পড়ে গেল এবং হট কেকের মতো বিক্রি হতে লাগল। চারটে ইস্যুর পর সার্কুলেসন চল্লিশ হাজারে উঠে গেল। তারপর বছর তিনেক আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি।

কিন্তু এ জাতীয় কাগজের সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও কম নেই। অনেকটা বাঘের পিঠে চড়ার মতো ব্যাপার। উঠলে আর নামা যায় না। ক্রমাগত সেনসেসানের যোগান দিয়ে যেতেই হয়। আজ যে সেনসেসান দেওয়া হল, পরের সংখ্যায় তার মাত্রা আরেকটু চড়াতে হয়, কেননা পাঠকের চাহিদা আর প্রত্যাশা ক্রমশ

বাড়তেই থাক।

আপাতত সেই সেনসেসানের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছেন অমিতাভ। ডিমান্ড অনুযায়ী সাপ্লাইটা তেমন হয়ে উঠছে না। অর্থাৎ যেমনটি তিনি চান, তাঁর রিপোর্টাররা ততটা দিয়ে উঠতে পারছে না। দেশটা তো এখনও ইওরোপ আমেরিকা হয়ে যায় নি। পনের দিন পর পর চড়া 'সেনসেসান' জোগাড় করা সহজ নয়।

অন্য দিনের মতো আজ দুপুরেও অমিতাভর চেম্বারে এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্টের মিটিং বসেছিল। অর্ধবৃত্তাকার একটা টেবলের একদিকে স্বয়ং অমিতাভ এবং তাঁর মুখোমুখি পাক্ষিক দিনকাল-এর ছ'জন সাংবাদিক—সুবিনয় মজুমদার, সন্দীপ সেন, আনন্দ রায়, বাদল চৌধুরী, যোগেন ভট্টাচার্য এবং তরুণ দত্ত। এই টিম নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ তিনি কাঁপিয়ে দিচ্ছেন।

অমিতাভ বলেন, 'লাস্ট চারটে ইস্যুতে আমরা কিন্তু তেমন কোনো 'কিক' রিডারকে দিতে পারি নি। কি হে সুবিনয়—' একটা পলিটিকাল পার্টির বিখ্যাত এক নেতার নাম করে বলেন, 'তুমি বলেছিলে ওঁর কী সব কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেবে!'

সুবিনয়ের বয়স আঠাশ-উনত্রিশ। সে রাজনৈতিক নেতাদের কেচ্ছার ব্যাপারগুলো জোগাড় করে। পলিটিকাল সার্কেলে তার দারুণ কনট্যাক্ট বা যোগাযোগ। তাই ভাঙিয়ে সে নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়। অর্থাৎ যে তার টার্গেট হবে, তার শত্রু বা বিরুদ্ধ পক্ষটিকে প্রথমে খুঁজে বার করে সুবিনয়, এবং তার কাছ থেকেই নানারকম মালমশলা আর ডকুমেন্ট বাগিয়ে স্টোরি তৈরি করে।

সুবিনয় বলে, 'অতবড় একজন লীডারের গায়ে হাত দেবো। পুরো প্রমাণ-ট্রমাণ হাতে না নিয়ে নামলে ঝামেলা হয়ে যাবে অমিতাভদা। ডিফেমেসন কেস তো হবেই। তা ছাড়া পার্টির মাস্তানদের লাগিয়ে লাশও ফেলে দিতে পারে।'

অমিতাভ জিজ্ঞেস করেন, 'কমপ্লীট প্রুফ-ট্রুফ পেতে আর কতদিন লাগবে?'

'মনে হচ্ছে নেক্সট উইকেই সব পেয়ে যাব। যার কাছ থেকে

পাওয়ার কথা সে ভীষণ বিজি লোক। আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই করে বেড়ায়। তবে আমিও ফেভিকলের মতো তার গায়ে সেঁটে আছি।'

আনন্দ আর সন্দীপ পুলিশ এবং ইনকাম ট্যাক্সের উঁচু মহলের কেলেংকারি ঘাঁটাঘাঁটি করে। বাদল, যোগেন এবং তরুণকে নির্দিষ্ট কোনো ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। তারা স্ক্যান্ডালের খোঁজে গোটা কলকাতা চষে বেড়ায়। যখন যা পায় তা-ই দিয়ে স্টোরি তৈরি করে।

আনন্দ, সন্দীপ আর বাদল জানায়, তারা কয়েকদিনের মধ্যেই দারুণ দারুণ 'কপি' দেবে।

সবার শেষে রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে অমিতাভ টেবিলের ডান দিকে তরুণের দিকে তাকান। বলেন, 'বম্বে থেকে ফিরে এসে তুমি রোজই শাসাচ্ছ, দুর্দান্ত কী একটা দেবে—সেনসেসন অফ দা ডিকেড। তার কী হল?'

তরুণ ঠোঁট কামড়ে, একটা চোখ সামান্য কুঁচকে রহস্যময় হেসে বলে, 'দেবো অমিতাভদা, নিশ্চয়ই দেবো। ওটা ছাপা হলে আমাদের কাগজের সার্কুলেসন এক লাফে থার্টি-টু-ফর্টি থাউজেন্ড বেড়ে যাবে। হরিণ খরগোশ মারা আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারা তো এক ব্যাপার নয়। বিগ গেমের জন্যে একটু সময় দিতে হয়। ইটস আ মিলিয়ন ডলার সেনসেসন।'

'সময় দিতে রাজী আছি কিন্তু কতদিন?'

'ম্যাক্সিমাম ফিফটিন্ টোয়েন্টি ডেজ।'

'ও. কে।'

'আমার একটা পাওয়ারফুল টেলি ক্যামেরা চাই।'

'পাবে।'

'আর চাই একটা গাড়ি, সেটার ট্যাংকে প্রচুর পেট্রোল। ক'দিন ট্যাক্সিতে ঘুরে ঘুরে জিভ বেরিয়ে গেছে। তা ছাড়া কোথাও গাড়ি থামিয়ে ওয়েট করতে হয়। ট্যাক্সিওলা রাজী হতে চায় না, ঘ্যান ঘ্যান করে।'

'নো প্রবলেম। কবে ক্যামেরা-ট্যামেরা দরকার বল—'

'আজ পেলেই ভাল হয়।'

একটু ভেবে অমিতাভ বলেন, 'আজ আর হবে না। কাল সব পেয়ে যাবে।'

তরুণ বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

অমিতাভ বলেন, 'ভাল কথা, তোমার ট্যাক্সির ভাড়া যা লেগেছে তার বিল করে দিও।'

'তা তো দেবোই।'

টেবলের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে অমিতাভ বলেন, 'একটা ব্যাপারে একটু কৌতূহল হচ্ছে।'

তরুণ অমিতাভর চোখের দিকে তাকায়, 'কী ?'

'কাউকে ফলো করছ নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'পুরুষ না মহিলা ?'

'পুরুষ—'

'লোকটা কে ?'

'ওটা সিক্রেট। এখন কিছু বলব না। হাতে যখন গরম স্টোরি পাবেন তখন সব জানতে পারবেন। ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।'

অমিতাভ হেসে ফেলেন, 'ঠিক হ্যায়।'

একটা ঝকঝকে সবুজ অ্যামবেসেডর আর দামী টেলি ক্যামেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অমিতাভ। তরুণের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, কাজেই শোফার নেওয়ার প্রশ্নই নেই। পরদিন বিকেলে, অফিস ছুটির আগে কলকাতার নতুন বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট-এ জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর হাই-রাইজ বিশাল অফিস কমপ্লেক্স-এর বাইরের ফুটপাথ ঘেঁষে তার অ্যামবেসেডরটা পার্ক করে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে তরুণ। বম্বে থেকে ফেরার পর ট্যাক্সি নিয়ে ক'দিন ধরে সকালের দিকে মল্লিনাথদের নিউ আলিপুরের বাংলোর সামনে ওত পেতে থেকেছে সে কিন্তু কিছুই লাভ হয় নি। মল্লিনাথের লিমুজিন অন্য কোনো দিকে যায় নি, একবগ্‌গা তীরের মতো মাঝের হাট ব্রিজের ওপর দিয়ে সোজা জেনিথ-এন্টারপ্রাইজেস-এর হেড কোয়ার্টার্সে পেঁছে গেছে। দু'দিন বাদে

পুরো অফিস টাইমে একবারও বেরোন নি মল্লিনাথ। যে দু'দিন বেরিয়েছিলেন, তরুণ তাঁর পিছু নিয়েছে। তবে তাকে হতাশই হতে হয়েছে। একদিন মল্লিনাথ গিয়েছিলেন চেম্বার অফ কমার্সে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে, আরেকদিন চৌরঙ্গীর এক ফাইভ স্টার হোটেলে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির দেওয়া লাঞ্চ পার্টিতে। দু'দিনই ঘন্টা দেড় দুই কাটিয়ে আবার অফিসে ফিরে এসেছেন।

তরুণের খটকা লাগছিল তবে কি বম্বে থেকে ফেরার পর মণিকার সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে মল্লিনাথের? চড়া দামে যার শরীর কয়েক দিনের জন্য কেনা হয়, কাজ ফুরোবার পর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই দুনিয়ার রীতি। কিন্তু তরুণ খুবই নাছোড়বান্দা টাইপের সাংবাদিক। মল্লিনাথ এবং মণিকাকে যেরকম ঘনিষ্ঠভাবে বম্বেতে দেখেছে, তাতে তার মনে হয়েছে দু'জনের সম্পর্কটা রাস্তায় ফাস্ট ফুড খেয়ে কাগজের প্লেট ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো নয়। যদি ওঁরা টেলিফোনে যোগাযোগ রেখে চলেন, কিছুই করার নেই। তবে দেখাশোনাটাও অবশ্যই হচ্ছে। সেটা কিভাবে, কোথায়, সেটাই ধরা যাচ্ছে না।

বম্বে থেকে ফেরার পর নিষ্ঠাভরে মল্লিনাথের পেছন পেছন নিউ আলিপুর থেকে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর হেড অফিসে এসে প্রায় চারটে সাড়ে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেছে তরুণ। দিন তিনেক আগে হঠাৎ তার মনে হল, সকালের দিকে মল্লিনাথকে 'ফলো' করে কাজ হবে না। দিনের বেলা কেউ কি আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তিফার্তা করতে বেরোয়—বিশেষ করে মল্লিনাথের মতো একজন এত বিরাট মাপের শিল্পপতি? সব দিক বজায় রেখে তারপর তো অনন্দ টানন্দ। মণিকার সঙ্গে যোগাযোগটা তিনি নিশ্চয়ই সন্ধের পর করে থাকেন, অন্তত লজিক তাই বলে।

তিন দিন আগে থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সকালের বদলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর হেড অফিসের সামনে অপেক্ষা করতে শুরু করেছে তরুণ। প্রথম দিন অবশ্য বিশেষ সুবিধা হয় নি। অফিস ছুটি হওয়ার পর মল্লিনাথের পিছু ঠিকই নিয়েছিল সে কিন্তু একটা ট্রাফিক সিগনালের কাছে এসে গোলমাল

হয়ে যায়। মল্লিনাথের লিমুজিনটা বেরিয়ে যাবার পর তার ট্যাক্সি যখন রাস্তার ক্রসিং পেরুতে যাচ্ছে সেই সময় লাল আলো জ্বলে ওঠে। অগত্যা তাকে থেমে যেতে হয়। মিনিট পাঁচেক পর যখন ফের সবুজ আলো জ্বলে ততক্ষণে মল্লিনাথের লিমুজিনটা একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

পরের দু'দিন অবশ্য তরুণের অভিযান ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা সফল। ট্যাক্সিওলাকে প্রচুর এক্সট্রা পয়সা কবুল করে মল্লিনাথের লিমুজিনের গায়ে প্রায় আঠার মতো সেঁটে থেকেছে সে। সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে গাড়ি বদল করে মণিকার গাড়িতে উঠেছেন মল্লিনাথ। এক মুহূর্তের জন্য তাঁদের চোখের বাইরে যেতে দেয় নি তরুণ। ওঁরা যেখানে যেখানে গেছেন, সে-ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। তারপর রাত সাড়ে দশটায় ফের মল্লিনাথেরা ভিক্টোরিয়ায় ফিরে এসেছেন। আবার গাড়ি বদল। এবার মণিকাকে সঙ্গে করে অবিনাশ গেছে নর্থ ক্যালকাটায় আর মল্লিনাথ নিউ আলিপুরে।

মল্লিনাথের বাড়ি, অফিস—সবই তরুণের চেনা। কিন্তু মণিকার ঠিকানাটা জানা খুবই জরুরি। সে মণিকাদের পিছু নিয়েছিল কিন্তু তার বাড়িটা শেষ পর্যন্ত দেখে আসা সম্ভব হয় নি। হ্যারিসন রোড পর্যন্ত মণিকার গাড়িটা নজরে রাখতে পেরেছিল। তার ট্যাক্সি আর মণিকাদের ফোরেন কার-এর মাঝখানে ছিল মাত্র তিনখানা গাড়ি। কিন্তু হ্যারিসন রোড পেরিয়ে মহাজাতি সদন-এর কাছাকাছি আসতেই আচমকা লোডশেডিং হয়ে যায়। ঘন অন্ধকারে মণিকাদের গাড়িটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তরুণ ঠিক করে রেখেছে, আজ যেভাবেই হোক, মণিকার ঠিকানাটা বার করবেই।

পাঁচটায় এ পাড়ায় ছুটি হয়ে গেল। চারিদিকের বিশাল বিশাল অফিস বিল্ডিংগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এ অঞ্চলটায় সারাদিন স্রোতের মতো গাড়ি ছুটতে থাকে। এবার তা দশ গুণ বেড়ে যায়। অসংখ্য মানুষের ভিড়, মোটরের হর্ন—সব মিলিয়ে জায়গাটা এখন সরগরম।

কিন্তু কোনোদিকেই লক্ষ নেই তরুণের। সে পলকহীন জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর মেইন গেটের যে অংশে ইংরেজিতে 'আউট' লেখা আছে সেদিকে তাকিয়ে আছে। মল্লিনাথের লিমুজিন বেরুনোমাত্র সে পিছু নেবে।

আজ অফিস ছুটির পরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। সোয়া ছ'টায় মল্লিনাথ বেরুলেন আর ঝানু গোয়েন্দার মতো নিঃশব্দে তাঁর পেছন পেছন চলল তরুণ।

ধরা পড়ার ভয়ে রোজ এক জায়গায় মণিকাদের সঙ্গে দেখা করেন না মল্লিনাথ। একদিন যদি রবীন্দ্র সদনের উল্টোদিকে দেখা হয় তো আরেক দিন ডায়মন্ড হারবার রোডের নির্দিষ্ট কোনো জায়গায়। আজ সল্টলেক স্টেডিয়ামের কাছে মণিকাকে নিয়ে অবিনাশকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন মল্লিনাথ। গাড়িটা এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়েন তিনি। শোফার তারপর লিমুজিনটা নিয়ে চলে যায়।

শ'খানেক গজ দূরে তার সবুজ অ্যামবেসেডরটা থামিয়ে বসে থাকে তরুণ। সে জানে দু-আড়াই ঘণ্টা বাদে ফের মল্লিনাথের লিমুজিন এখানে চলে আসবে। তারপর গাড়িবদল করে যে যার জায়গায় চলে যাবেন।

অন্য দিন মণিকার গাড়িতে উঠে চলে যান মল্লিনাথ। তাঁর পেছনে চরকির মতো ঘুরতে থাকে তরুণ।

মল্লিনাথ যেখানে নেমেছেন সেখান থেকে দু'আড়াই শ গজ তফাতে মণিকার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে এগিয়ে যান। নিশ্চয়ই মণিকার গাড়িতে উঠে পড়বেন। মল্লিনাথ উঠলেই তরুণকে স্টার্ট দিতে হবে। সে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অপেক্ষা করতে থাকে।

হঠাৎ অভাবনীর একটা ব্যপার ঘটে যায়। আজ আর মণিকার গাড়িতে ওঠেন না মল্লিনাথ, মণিকাই নেমে আসে। স্টেডিয়ামের এদিকটা মোটামুটি নির্জন। রাস্তার তেজী আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। কিছু লোকজন এধারে ওধারে চোখে পড়ে। হুস হুস করে দারুণ স্পীডে প্রাইভেট কার ছুটে যাচ্ছে। মল্লিনাথ এবং মণিকা পরস্পরের হাত ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। ওঁরা

হয়ত ভেবেছেন, সল্টলেকের এই অংশটা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ, পৃথিবীর কেউ তাঁদের ওপর নজর রাখছে না।

কলকাতায় ফেরার পর এভাবে দু'জনকে আর পাওয়া যায় নি। গাড়িটা মল্লিনাথদের দিকে খানিক এগিয়ে নিয়ে জানালার কাচ নামিয়ে ক্যামেরায় চোখ রেখে পর পর বোতাম টিপে যায়।

ঘন্টাখানেক হাঁটার পর গাড়িতে গিয়ে বসেন মল্লিনাথরা। অন্য দিন ওঁদের জানালার কাচ বন্ধ থাকে। আজ সব খোলা। দূর থেকে তরুণ দেখতে পায় একই প্লেট থেকে খাবার তুলে খেতে খেতে কী এক মজার কথায় দু'জনে সমানে হাসছেন। দৃশ্যটি ক্যামেরায় তুলে নেয় তরুণ।

আরো ঘন্টাখানেক বাদে আজকের মতো বিদায় নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে স্টেডিয়ামের ডান দিকে হাঁটতে থাকেন মল্লিনাথ। তরুণ বুঝতে পারে, মল্লিনাথ তাঁর শোফারকে লিমুজিন নিয়ে ওধারে কোথাও দাঁড়াতে বলেছেন।

এখন মল্লিনাথের গতিবিধি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই তরুণের। সে একদৃষ্টে মণিকার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, মিনিট পাঁচেকের ভেতর কোত্থেকে অবিনাশ চলে আসে এবং মণিকার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয়।

তরুণও তার সবুজ অ্যামবেসেডরটাকে মণিকাদের পেছনে লেলিয়ে দেয়। ইস্টার্ন বাই-পাস ধরে ডান দিকে খানিক এগিয়ে উল্টোডাঙা রেল ব্রিজের তলা দিয়ে পর পর দুটো গাড়ি ফের একটা ওভার ব্রিজে উঠে চলে আসে সার্কুলার রোডে। তারপর হাতি-বাগান হয়ে গ্রে স্ট্রিটে এসে পড়ে। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ পার হয়ে খানিক এগিয়ে বাঁ দিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ে মণিকাদের গাড়িটা। তরুণ তার অ্যামবেসেডরটাকে গলিতে নিয়ে যায় না, বড় রাস্তায় পার্ক করে রেখে সতর্ক ভঙ্গিতে এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে গলির মুখে এসে দাঁড়ায়।

বড় রাস্তা থেকে সাতখানা বাড়ির পর একটা পুরনো ধাঁচের দোতলার সামনে মণিকাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ক্যালকাটার এই অঞ্চলটায় এই মুহূর্তে লোডশেডিং নেই। চারিদিকে প্রচুর আলো। এমন কি রাস্তার সব টিউব ল্যাম্প জ্বলছে।

তরুণ দেখতে পায়, গাড়ি থেকে নেমে অবিনাশের সঙ্গে নিচু গলায় কিছু কথা বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে মণিকা।

অবিনাশের সঙ্গে আলাপ নেই তরুণের। বম্বেতেই সে তাকে প্রথম দেখেছে। জুহুর গেস্ট হাউসে থাকার সময় অবিনাশের নামটা জেনে নিয়েছে। মণিকা আর মল্লিনাথের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী, বুঝতে অসুবিধা হয় নি তার। এক শিল্পপতি আর এক গণিকার মাঝখানে যোগাযোগকারীর ভূমিকা অবিনাশের, খারাপ কথায় সে বেশ্যার দালাল।

মণিকা বাড়ির ভেতর ঢোকার পর গাড়ি নিয়ে অবিনাশ গলির ওধার দিয়ে চলে যায়। তারপরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তরুণ। এখন সে কী করবে? হুট করে এতরাতে মণিকার কাছে হানা দেওয়াটা কি ঠিক হবে? তরুণ জিতেন্দ্রিয় শুকদেব নয়, তার চরিত্রটি পবিত্র গঙ্গাজলে ধোওয়াও নয়। মেয়েমানুষ সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ ছোঁকছোঁকানি আছে। সুযোগ এসে গেলে গোপনে, অতীব তৎপরতার সঙ্গে সেটি কাজে লাগিয়ে থাকে। এখনও বিয়ে করে নি, এই দুর্বলতাটুকু তো স্বাভাবিক। কিন্তু আজ ফুর্তি-ফার্তার কথা তার মাথায় নেই, সে এসেছে তার প্রফেসানের খাতিরে, কিছু চাঞ্চল্যকর খবর জোগাড় করতে। তা ছাড়া যে মেয়েমানুষটি মল্লিনাথের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের প্রমোদসঙ্গিনী হতে পেরেছে, দেহের সীমারেখা পেরিয়ে যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক গভীরে পেঁছেছে, সে তরুণের মতো আড়াই হাজার টাকা মাইনের এক সামান্য জার্নালিস্টকে পাত্তা দেবে কেন? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে মনস্থির করে ফেলে আজ মণিকার সঙ্গে দেখা করবে না। তবে তার বাড়ির চারপাশটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে যাবে। কেননা, এমনও হতে পারে, কাল থেকে দিনের অনেকটা সময় এখানেই তাকে ওত পেতে বসে থাকতে হবে।

একসময় পায়ে পায়ে গলির ভেতর এগিয়ে যায় তরুণ। নর্থ ক্যালকাটায় এই অঞ্চলটা সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার। এখানে ভদ্রপাড়ার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে বনেদী গণিকাদের এলাকা। এ পাড়ায় যাদের নিয়মিত যাতায়াত তারা জানে কোনগুলো গেরস্তর বাড়ি আর কোনগুলো বাজারে মেয়েদের।

বেশ্যাবাড়ির খদ্দেররা পারতপক্ষে পবিত্র ভদ্রবাড়িতে হানা দেয় না। এখানকার এটা যেন অলিখিত নিয়ম।

তীক্ষ্ণ নজরে প্রতিটি বাড়ি, বিশেষ করে মণিকাদের দোতলাটা লক্ষ করতে করতে ধীরে ধীরে গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত একবার ঘুরে আসে তরুণ। বাড়িগুলোর গায়ে পুরনো কলকাতার ছাপ মারা আছে। তবু তার ভেতর কোনটা ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি আর কোনটা তা নয়, যেন আঁচ করা যায়।

এগারটা বেজে গেছে। এত রাতে এ গলিতে লোক চলাচল অনেক কমে এসেছে। এখানে যে মেয়েরা দেহের পসরা সাজিয়ে বসে আছে তারা আদৌ সস্তা বা ওঁচা নয়। এটা খোলো নারী-মাংসের মীনাবাজার নয়। চড়া দামে এখানে শরীরের বিকিকিনি চলে। কাজেই সোসাইটির একেবারে নিচের তলার ঝড়তি পড়তি রদ্দি লম্পটেরা এদিক মাড়ায় না। গেল শতকের বাবু কালচারের যে সামান্য তলানিটুকু এখন যাদের মধ্যে থেকে গেছে তাদের কেউ কেউ গিলে-করা পাঞ্জাবি আর কুঁচনো ধুতি চড়িয়ে গায়ে প্রচুর সেন্ট ঢেলে এখানে আসে। আর আসে এখনকার বিজনেসম্যান, কনট্রাক্টর ইত্যাদি নতুন পয়সাওলা লম্পটেরা। তাদের বাঁধা মেয়ে-মানুষ আছে, সুট করে নির্দিষ্ট বাড়ি বা ফ্ল্যাটে তারা ঢুকে পড়ে।

মণিকাদের বাড়ির উল্টোদিকে, খানিকটা কোনাকুনি একটা ছোটখাটো রেস্তোরাঁ এত রাতেও খোলো রয়েছে। খদ্দের টদ্দের খুব একটা নেই। এ কোণে ও কোণে দু-চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

কী ভেবে রেস্তোরাঁয় ঢুকে যায় তরুণ, একধারে একটা ফাঁকা টেবলের সামনে বসে পড়ে।

একটা পনের ষোল বছরের ছোকরা কাছে এসে দাঁড়ায়। সে এখানকার বেয়ারা। বলে, 'কী দেবো বাবু?'

সেই বিকেল থেকে মণিকাদের পেছন পেছন এত ছোটাছুটি করতে হয়েছে যে কিছু খেয়ে নেবার সময় পাওয়া যায় নি। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। তরুণ জিজ্ঞেস করে, 'কী পাওয়া যাবে?'

'ডেভিল, মাটন চপ, চিকেন কাটলেট, ফিশ ফ্রাই, ভেজিটেবল চপ, দো-পেঁয়াজি—' গড় গড় করে একগাদা নাম মুখস্থ বলে যায়

ছোকরা।

তাকে থামিয়ে দিয়ে তরুণ বলে, 'একটা চিকেন কাটলেট, দুটো টোস্ট নিয়ে এসো। পরে চা দেবে।'

মিনিট দশেকের ভেতর খাবার এসে যায়। খেতে খেতে তরুণ ঠিক করে ফেলে এখানেই তাকে ঘাঁটি গাড়তে হবে। প্রথমত, মণিকার খোঁজখবর নিশ্চয়ই রেস্তোরাঁর লোকেরা রাখে। তাদের হাতে মোটা টাকা গুঁজে দিলে অবশ্যই কাজ হবে। তা ছাড়া তরুণের ধারণা, আজ হোক কাল হোক, একদিন না একদিন মল্লিনাথ এখানে আসবেনই। তখন কিছু ছবি তোলা দরকার। বারবণিতার বাড়ির দরজায় শিল্পপতিকে ক্যামেরায় ধরে রাখতে পারলে সে ছবির দাম যে কী, সেটা যারা ইয়েলো জার্নালিজম করে তারাই শুধু জানে। কাগজে ছাপিয়ে সেনসেসান তো করা যাবেই। তবে সবগুলো সে ছাপবে না। কয়েকটা বাছা বাছা ছবি না ছাপিয়ে সেগুলোকে বঁড়শির মতো ব্যবহার করবে। সেই বঁড়শি মল্লিনাথের আলটাকরায় আটকে রেখে আমৃত্যু তাকে দোহন করা যাবে।

তরুণ আগে লক্ষ করে নি, সে যেখানে বসে আছে, তার বাঁ দিকের শেষ টেবলটা থেকে একটা পোকায়-কাটা সিড়িঙ্গে চেহারার আধবয়সী লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ঘাড় ফেরাতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। চোখ কুঁচকে নিঃশব্দে হাসে সে, হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। অগত্যা প্রতি নমস্কারের ভঙ্গিতে ডান হাতটা সামান্য তুলে সংশয়ের চোখে তাকায় তরুণ। লোকটার কী মতলব, বোঝা যাচ্ছে না।

নমস্কার করেই কিন্তু লোকটার উৎসাহ শেষ হয়ে যায় না। গুটি গুটি উঠে এসে তরুণের সামনে দাঁড়ায়, অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলে, 'আমার নাম পশুপতি পালধি। এখানে একটু বসতে পারি?' তরুণের অনুমতির অপেক্ষা না করেই মুখোমুখি বসে বড়ে।

তরুণ তেরছা চোখে পশুপতিকে দেখতে দেখতে কাটলেট চিবিয়ে যায়, একটা কথাও বলে না।

পশুপতি বলে, 'আপানাকে স্যর এই রেস্টুরেন্টে নতুন দেখছি—'

তরুণ বলে, 'কী করে বুঝলেন আমি নতুন?'

'সকাল থেকে মাঝ রাত্তির পর্যন্ত এখানে বসে থাকি। কোন খদ্দের নতুন আর কে পুরনো—জানব না?'

'আপনি দিনরাত এখানে থাকেন?'

পশুপতি হে হে করে হেসে বলে, 'থাকব না? এখানে না থাকলে আমার রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাবে যে।' পেটে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে বলে, 'উপোস দিয়ে মরতে হবে গুষ্টিসুদ্ধু। স্যার, একটু চা খাওয়াবেন?'

লোকটা সম্পর্কে বেশ কৌতূহল হচ্ছিল তরুণের। সে বেয়ারাটাকে ডেকে চা এবং একটা ভেজিটেবল চপ দিতে বলে।

খাবার এলে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে পশুপতি। খাওয়া দেখে মনে হয়, তার পেটে রাহুর খিদে রয়েছে।

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চিন্তা তরুণের মস্তিষ্কে খেলে যায়। পশুপতি যখন দিবারাত্রি এখানে বসে থাকে তখন মণিকার খবর-টবর কি আর না রাখে? একে দিয়ে হয়ত কাজ হবে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, লোকটা রীতিমত ঘাঘু এবং ধূর্ত। তরুণ জিজ্ঞেস করে, 'আপনি এখানে কী করেন?'

পশুপতি এক ঢোক চা খেয়ে মিচকে হাসে। গলার স্বর ঝপ করে অনেক নামিয়ে বলে, 'স্যার, রাত্তিরে অনেক লোক এখানে ফুত্তিটুত্তি করতে আসে। আমি তাদের হেল্প করি।'

এবার বোঝা গেল, লোকটা বেশ্যার দালাল। অবিনাশের মতো সরাসরি তার সঙ্গে মণিকার যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। কোনো কথা না বলে চোখের কোণ দিয়ে পশুপতিকে জরীপ করতে থাকে তরুণ।

পশুপতি কানের কাছে মুখ এনে এবার ফিস ফিস করে, 'স্যার, আমার হাতে ফাইন ফাইন জিনিস আছে। চীন-এজার চান, বাঙালি চান, ননবেঙ্গলী চান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান চান—সব পাবেন। জীবনে পরপুরুষ ছোঁয় নি, এমন ফুলের মতো টাটকা মালও পাবেন, তবে দামটা একটু বেশি পড়বে।'

'আপনি সোজা হয়ে বসুন।'

কানের কাছে থেকে মুখ সরিয়ে নেয় পশুপতি। বলে, 'ভেরি

স্যরি স্যর। তা হলে—'

এত তাড়াতাড়ি এমন একটা লোককে পাওয়া যাবে, ভাবা যায়নি। কাজটা ঝুলিয়ে না রেখে এখনই শুরু করা দরকার। তরুণ বলে, 'মণিকা বলে একটা মেয়েকে চেনেন? এ পাড়ায় থাকে—'

'চিনব না কেন?' আঙুল বাড়িয়ে ডান দিকের সেই দোতলাটা দেখিয়ে দেয় পশুপতি, 'ওই যে, ওই বাড়িটায় থাকে। কিন্তু স্যর—'

'কী?'

'মগডালের ফ্রুট। হেভি দাম। তা ছাড়া—

'তা ছাড়া কী?'

'এখন ওর ধারেকাছে ঘেঁষা যাবে না স্যর।'

'কেন?'

'খুব বড় জায়গায় নৌকো ভিড়িয়েছে ছুঁড়ি।' পশুপতি চাপা গলায় বলতে থাকে, 'শুনেছি যে মক্কেলকে গেঁথেছে সে নাকি কোটি কোটি টাকার মালিক। কোটিপতি ফেলে কে অন্য দিকে তাকাবে বলুন!'

তরুণ বুঝতে পারে মল্লিনাথের কথা বলছে পশুপতি। অন্যমনস্কর মতো সায় দেয় সে, 'তা তো বটেই।'

'আমি অবশ্যি চার ফেলে রাখছি। বড়লোক বাবুর নেশাটা ছুটলেই আপনার কাছে ভিড়িয়ে দেবো।'

পকেট থেকে কুড়ি টাকার একখানা নোট বার করে পশুপতিকে দিতে দিতে তরুণ বলে, 'এটা অ্যাডভ্যান্স। শুনুন, ফুর্তিটুর্তির জন্যে মণিকাকে আমার দরকার নেই। ওর সম্বন্ধে আমার কিছু খবর চাই।'

সযত্নে নোটখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে পশুপতি শশব্যস্তে বলে, 'কী খবর স্যর?'

'ওর সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?'

'কী না জানি তাই বলুন। এই তো সেদিন ওকে জন্মাতে দেখলাম। চোখের সামনে বড় হল। মণিকার মা চেয়েছিল মেয়ে লেখাপড়া শিখুক, ভাল ঘরে বিয়ে হোক কিন্তু কপাল! মা মরার পর ওকে লাইনে ঢুকে পড়তে হল।' বলতে বলতে পশুপতির

গলায় বিষাদের ছোঁয়া লাগে, 'মেয়েটা কিন্তু সত্যিই ভাল স্যর। না জানলে কে বলবে বেশ্যাগিরি করে খায়। যাক গে, মণিকার নাড়ি নক্ষত্রের সব খবর আমার জানা। কী শুনতে চান, বলুন—'

তরুণ বলে, 'আজ থাক, অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল থেকে দুপুরে আসব, তখন বলবেন।'

'আচ্ছা স্যর।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন—' পশুপতি উন্মুখ হয়ে থাকে।

তরুণ বলে, 'যে কোটিপতির কথা বললেন তার নাম কী?'

'বলতে পারব না। অবিনাশ বলে একটা লোক আছে, সে মণিকার আসল এজেন্ট। সে-ই মক্কেলটাকে জুটিয়ে দিয়েছে। যদি বলেন, নামটা জেনে রাখব।'

মল্লিনাথের কথাটা জানাজানি হলে কাজের অসুবিধা হয়ে যাবে। পশুপতি যে টাইপের লোক তাতে ব্যাপারটা চাউর হওয়া অসম্ভব নয়। কোনোভাবে অন্য কাগজের লোকের কানে উঠলে এতদিনের ছোটাছুটি সব পন্ড হয়ে যাবে। তরুণ ভেতরে ভেতরে খানিকটা বিচলিত হলেও বাইরে পুরোপুরি নিস্পৃহ থাকে। সে বলে, 'না না, এমনি মনে হল, তাই জিজ্ঞেস করলাম। কষ্ট করে লোকটার নাম জানতে হবে না। পয়সা খরচ করে কত লোকই তো মজা লোটে, তাতে আমার কী?'

'ঠিক বলেছেন স্যর।'

একটু চুপচাপ।

তারপর পার্স থেকে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে পশুপতির দিকে এগিয়ে দেয়।

পশুপতি একেবারে হকচকিয়ে যায়। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল, কে জানে! নাসিক প্রেসে ছাপা নোটের এমন হরির লুট তার জীবনে কদাচিৎ ঘটে। সে বলে, 'এটা স্যর—' বাক্যটা আর শেষ করে না সে।

'আপনার জন্যে। পকেটে রাখুন—'

'এই তো দিলেন। ফের কেন?' বলতে বলতে ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে পকেটে পুরে ফেলে পশুপতি।

তরুণ বলে, 'এটা সেকেন্ড কাজের জন্যে অ্যাডভান্স—'

'আপনার কত কাজ আছে স্যর ?'

'অনেক। প্রত্যেক বার টাকা পাবেন।' লোভে দুটো ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ চকচকিয়ে ওঠে পশুপতির। সে বলে, 'দু নম্বর কাজের কথাটা এবার বলুন।'

তরুণ বলে, 'কাজটা কিন্তু খুব গোপন। কেউ টের না পায়।'

'কেউ পাবে না।'

তরুণ খানিকক্ষণ ভেবে নেয়। তারপর বলে, 'এমন একটা বাড়ি আমার দরকার যেখান থেকে মণিকার ঘরের ভেতর টেতর দেখা যায়।'

পশুপতি মণিকাদের ডান পাশের তেতলা বাড়িটা দেখিয়ে বলে, 'ওই বাড়িটার ছাদ উঠলে দেখা যাবে স্যর।'

'কিন্তু ওখানে আমাকে উঠতে দেবে কেন ?' বলে সোজা পশুপতির চোখের দিকে তাকায় তরুণ।

পশুপতি গলায় জোর ঢেলে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'আলবত দেবে। ওটা কার বাড়ি জানেন ? 'সুধার। আর আমি তার এজেন্ট। আমি কিছু বললে সে টুঁ শব্দটি করবে না।' বলতে বলতে হঠাৎ পশুপতির সমস্ত উদ্দীপনা মিইয়ে যায়, 'কিন্তু স্যর—'

কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করেছিল তরুণ। সতর্ক ভঙ্গিতে সে বলে, 'কী ?'

গলাটা প্রায় খাদে ঢুকিয়ে পশুপতি জিজ্ঞেস করে, 'আমি ফেঁসে যাব না তো ?'

'ফাঁসবেন কেন ?'

'আমার মাথায় হাত দিয়ে বলুন তো আপনি পুলিশের লোক নন।'

'কী আশ্চর্য, আমি—শুধু আমি কেন, আমার চোদ্দ পুরুষের কেউ কখনও পুলিশে চাকরি করে নি।'

'আমার মাথায় হাত দিন।'

তরুণ মাথায় হাত রাখতে খানিকটা আরাম বোধ করে পশুপতি। একটা বেশ্যার দালালের মাথা এতই পবিত্র বস্তু যে একে ছুঁয়ে মিথ্যাচার করা যায় না—এমন কথা কে জানতো !

তরুণ বলে, 'হয়েছে ?'

'হ্যাঁ স্যর—' পশুপতি জিজ্ঞেস করে, 'ওই ছাদে কি আপনি যেতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন যাবেন, জানতে ইচ্ছে করছে।'

'মণিকার ঘরের ক'টা ছবি তুলব।'

'কোনোরকম ঝঞ্ঝাট হবে না তো ?'

'আরে না না—'

'কবে ওখানে যেতে চান ?'

'সেটা তোমাকে পরে বলে দেবো। আবার বলছি কথাটা যেন গোপন থাকে।'

'পয়সা যখন নিয়েছি, থাকবে। আমি যার নুন খাই তার সঙ্গে নিমকহারামি করি না।'

'গুড। আচ্ছা, আজ তা হলে ওঠা যাক।'

চা এবং খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তরুণ।

দশ

ওদিকে অফিস ছুটির পর রোজই মল্লিনাথের সঙ্গে মণিকার দেখা হতে থাকে। আগে থেকেই মল্লিনাথ ফোনে জানিয়ে দেন, কখন কোথায় অবিনাশ মণিকাকে নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। আগে আগে শোফার তাঁর গাড়ি চালিয়ে আনত। ইদানীং তিনি নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে আসছেন। সাবধানের মার নেই। শোফারটা তাঁকে নামিয়ে চলে যাবার পর চারিদিক দেখেশুনে তবে তিনি মণিকার গাড়িতে উঠতেন। তবু হঠাৎ সে তাঁদের দু'জনকে দেখে ফেলে! তাই তাকে বাদ দেওয়ার কথাটা মাথায় এসেছে। এ সব কাজের সাক্ষী রাখতে নেই। যাই হোক নিজের গাড়িটা একধারে লক করে রেখে মল্লিনাথ মণিকার গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ নেমে গিয়ে তাঁর গাড়িতে বসে পাহারা দিতে থাকে।

মণিকা রোজই তাঁর জন্য নিজের হাতে রেঁধে বড় টিফিন

ক্যারিয়ার বোঝাই করে নিয়ে আসে। কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাঁরা খেয়ে নেন। তারপর কলকাতার রাস্তা দিয়ে শুধু ঘোরা আর ঘোরা আর অবিরাম গল্প করে যাওয়া।

দিনকয়েক হল, মণিকা একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসছে। মল্লিনাথ গাড়িতে ওঠামাত্র বোতাম টিপে সেটা চালিয়ে দেয়। যতক্ষণ মল্লিনাথ থাকেন, শুধু রবিশঙ্কর, জুবিন মেটা বা আলি আকবরের বাজনা অথবা বড়ে গোলাম বা লতা মঙ্গেশকরের কোনো আকুল-করা গান বাজতে থাকে।

দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ আবার তাঁরা অবিনাশ যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে ফিরে আসেন। গাড়ি বদল করে মল্লিনাথ ফিবে যান নিউ আলিপুরে, মণিকারা যায় নর্থ ক্যালকাটায়।

এর মধ্যে মল্লিনাথ একদিন পরিষ্কার জানিয়ে দেন, মণিকা অন্য কোনো ক্লায়েন্টের ভাবনা মাথা থেকে যেন বার করে দেয়। এখন সে একান্তভাবেই মল্লিনাথের। তিনি স্থির করে ফেলেছেন, মাস-খানেকের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার সুন্দর পরিবেশে তার জন্য একটা বড় ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দেবেন। এখন থেকে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব মল্লিনাথের। নর্থ ক্যালকাটার নোংরা আবহাওয়ায় তিনি তাকে থাকতে দেবেন না। তার হাতে তুলে দিতে চান নিশ্চিন্ত, মনোহর ভবিষ্যৎ।

মণিকা জিজ্ঞেস করে, 'ফ্ল্যাট তো হবে। তারপর ?'

মল্লিনাথ বলেন, 'তারপর কী ?'

'আমাকে ফ্ল্যাটে তুলে কী করতে চাও তুমি ?'

এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত নন মল্লিনাথ। তিনি হকচকিয়ে যান। বলেন, 'কিছু একটা নিশ্চয়ই করব।'

মণিকা শান্ত গলায় বলে, 'কী করবে, সেটাই তো জানতে চাইছি।'

চোখেমুখে একটা দিশেহারা ভাব যেন ফুটে ওঠে মল্লিনাথের। সে বলে, 'এখনও ঠিক ভেবে উঠতে পারি নি। তবে ডিসিশান আমাকে একটা নিতেই হবে।'

'ডিসিশান নাও। তারপর না হয় তোমার ফ্ল্যাটে যাওয়া যাবে। কারো বিলাস-সঙ্গিনী হয়েই যদি থাকতে হয়, সাউথ ক্যালকাটাও

যা, নর্থ ক্যালকাটাও তা-ই। শুধু শুধু ঠিকানা বদল করে কী লাভ ?'

ম্লান মুখে সামান্য হাসেন মল্লিনাথ। বলেন, 'সেটা অবশ্য ঠিক।'

এইভাবেই চলছিল।

ইচ্ছা করলে কলকাতার দশটা 'পশ' জায়গায় দশটা দুর্দান্ত ফ্ল্যাটে মণিকার মতো দশজন রক্ষিতাকে রেখে গোপনে পুষতে পারতেন মল্লিনাথ। আনকোরা ভীরু প্রণয়ীদের মতো রাস্তায় রাস্তায় এভাবে ঘুরে বেড়াতে হ'ত না। কিন্তু তাঁর মধ্যে সাহসের অভাব তো রয়েছেই। তা ছাড়া যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার তা এই-রকম। নিষিদ্ধ কিছুর আস্বাদ নেওয়ার মধ্যে প্রচণ্ড এক উন্মাদনা রয়েছে, রয়েছে রোমাঞ্চ। সেই কারণেই এই লুকোচুরি, এই গোপনতা।

কিন্তু মল্লিনাথরা জানতেন না, সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। তরুণ দত্ত টেলিলেন্সওলা ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সেই যে চতুর বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বম্বেতে তাঁদের পিছু নিয়েছিল, তারপর গন্ধ শুঁকে শুঁকে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে। মল্লিনাথের বাড়ি আর অফিস তার জানাই ছিল কিন্তু খুঁজে খুঁজে সে মণিকার নর্থ ক্যালকাটার ঠিকানাও বার করে ফেলেছে।

তরুণ চাইছে, মণিকা আর মল্লিনাথকে নায়ক-নায়িকা করে খুব তাড়াতাড়ি একটা চনমনে ধারাবাহিক স্টোরি শুরু করতে। সে চায়, পাঠকের শিরায় শিরায় তীব্র সেনসেসান ঢুকিয়ে দিতে।

মল্লিনাথরা জানেন না, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁরা তরুণের চোখের বাইরে যেতে পারেন নি। ক্রমশ নিজেদের অজান্তে একটা মারাত্মক ফাঁদের মধ্যে তাঁরা পা দিয়ে ফেলেছেন।

এর মধ্যে একদিন অফিসে বেরুবার জন্য যখন মল্লিনাথ তৈরি হচ্ছেন, হঠাৎ একটু হইচই শোনা যায়। উৎসুক চোখে জানালার বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ে একটা সাদা মারুতি ভ্যান থেকে নামছেন অনুরাধা। বম্বে থেকে কলকাতায় ফেরার পর স্ত্রীর খোঁজ নিয়েছিলেন মল্লিনাথ। কাজের লোকেরা জানিয়ে ছিল, দিন কয়েক বাদে অনুরাধা ফিরবেন। অবশ্য একবার বেরুলে ফেরার ঠিক

থাকে না তাঁর।

স্ত্রী সম্পর্কে একবারই যা খোঁজ নিয়েছিলেন মল্লিনাথ। তারপর তাঁর কথা আর খেয়াল ছিল না। আজ আবার মনে পড়ে গেল, অনুরাধা ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে একটা অভিনন্দন জানানো দরকার।

জানালার বাইরে তাকিয়েই আছেন মল্লিনাথ। ওদিকে অনুরাধা গাড়ি থেকে নেমে লন-এর ভেতর দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে আসেন। দু-তিনটে ঢাউস ঢাউস স্যুটকেস আর বাস্কেট হাতে ঝুলিয়ে দুটো বেয়ারা শশব্যস্তে তাঁর পেছন পেছন আসতে থাকে।

একটা ব্যাপার বরাবরই লক্ষ করেছেন মল্লিনাথ। অনুরাধা বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আবহাওয়াটা একেবারে বদলে যায়। কাজের লোকেরা তটস্থ হয়ে ওঠে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

অন্যদিন ন'টায় বেরিয়ে যান মল্লিনাথ। আজ স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অনুরাধা একটু রেস্ট নেবার পর তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। আধ ঘন্টা পর একটা বয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'মেমসাহেবকে বল, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'জি, সাব—' বয়টা চলে যায়। একটু পর ফিরে এসে বলে, 'মেমসাহেব পাঁচ মিনিটকা অন্দর আপকো কামরামে আ যায়গি।'

দস্তুরমতো অবাকই হয়ে যান মল্লিনাথ। আগে কখনও তাঁর ঘরে অনুরাধা এসেছেন কিনা, মনে নেই। বাইরের প্যাসেজ বা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা হয়েছে, নইলে মল্লিনাথ তাঁর ঘরে গিয়ে কথা বলেছেন। হঠাৎ কী এমন হল যাতে এই পরিবর্তন ঘটে গেছে? ভারতবর্ষের বাইরের বিরাট সম্মান কি অনুরাধাকে খানিকটা উদার করে দিয়েছে?

পাঁচ মিনিটও নয়, তার আগেই অনুরাধা চলে আসেন। এখনও স্নান করেন নি তিনি, তবে চোখেমুখে জল দিয়ে মুছেছেন, শাড়ি-টাড়ি বদলে একটা হাউসকোট পরেছেন।

মল্লিনাথ বলেন, 'এসো—এসো। বসো—' অনুরাধা বসলে বলেন, 'কনগ্রাচুলেসনস। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

নরম গলায় অনুরাধা বলেন, 'ধন্যবাদ।'

'বম্বে যাবার সময় রাস্তায় 'বিদর্ভ টাইমস'-এ তোমার প্রাইজের

খবরটা পেলাম। ভাবলাম, বম্বে পেঁছে টেলেক্সে অভিনন্দনটা জানিয়ে দেবো। পরে ঠিক করলাম, না, কলকাতায় ফিরে একেবারে সামনাসামনি কনগ্রাচুলেট করব। কিন্তু এখানে এসে শুনলাম তুমি দিল্লী গেছ।'

'হ্যাঁ। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সোশাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রির একটা গ্রান্ট আটকে গিয়েছিল। সেটা আনতে যেতে হল।'

'পেয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ। কাজটা হয়ে যাবার পরই ফিরে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু ওখানেই খবর পেলাম ম্যাগসেসে প্রাইজটা এ-বছর আমাকে দেওয়া হয়েছে। ওখানকার বন্ধুরা কিছুতেই আসতে দিল না। নানা অর্গানাইজেসন বেশ কয়েকটা সংবর্ধনা দিল। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।'

মল্লিনাথের মনে হল, তাঁরও কিছু করা দরকার। বলেন, 'তোমার অনারে আমাকেও কিছু একটা করতে হবে।' আসলে এটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার। স্ত্রীর এত বড় একটা সম্মান প্রাপ্তিতে তিনি যদি চুপচাপ বসে থাকেন, সেটা ভাল দেখায় না। বাইরের ঠাটটা অন্তত বজায় রাখতেই হবে।

অনুরাধা জিজ্ঞেস করেন, 'কী করতে চাও?'

এ নিয়ে ভাবেন নি মল্লিনাথ। কিছু করা প্রয়োজন—এটুকুই শুধু তাঁর মাথায় এসেছিল। খানিক চিন্তা করে বলেন, 'এই বাড়িতে একটা পার্টি দিয়ে কলকাতার টপ সোসাইটির লোকজনকে আর প্রেসকে ডাকব।'

অনুরাধা বলেন, 'না না, এ সব করতে যেও না।'

বলার ভঙ্গিতে টের পাওয়া যায় অনুরাধার আপত্তিটা তেমন জোরালো নয়। মল্লিনাথ বলেন, 'প্লিজ, ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি রাজী না হলে আমি খুব দুঃখ পাবো।'

অনুরাধা হাসেন, 'যা ভাল বোঝো করো।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'এবার তোমার বম্বে ট্রিপটা কেমন হল?'

মল্লিনাথ চকিত হয়ে ওঠেন। অনুরাধা কি মণিকার ব্যাপারে কিছু টের পেয়েছেন? পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়, তেমন আঁচ পেলে তিনি এ ঘরে আসতেনই না। তাছাড়া অনেক আগেই বুঝিয়ে

দিতেন, কত বড় দুষ্কর্ম করে বসেছেন মল্লিনাথ। নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত মুখে বলেন, 'চমৎকার।'

'যে কাজে গিয়েছিলে সেটা সাকসেসফুল?'

'হ্যাঁ। ডোনা ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে জয়েন্ট ভেনচারের ব্যাপারটা ফাইনাল হয়ে গেছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অনুরাধা মল্লিনাথকে ভাল করে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অফিসে বেরুবার জন্যে রেডি হচ্ছিলে?'

মল্লিনাথ বলেন, 'হ্যাঁ। তুমি এসে গেলে, তাই ভাবলাম একটু কথা বলে যাই।'

'তোমাকে আর আটকাব না।' বলতে বলতে উঠে পড়েন অনুরাধা, 'তুমি বেরিয়ে পড়।'

মল্লিনাথও উঠে দাঁড়ান, 'অনেকখানি জার্নি করে এসেছ। নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড?'

উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসেন অনুরাধা।

মল্লিনাথ বলেন, 'এখন আর কোথাও না বেরিয়ে ভাল করে রেস্ট নাও।'

'তার কি উপায় আছে? প্রেসের লোকেরা টের পেয়ে গেছে, আমি আজ কলকাতায় আসছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এখানে হানা দেবে।'

'তা হলে আর কী করা! বিশ্রামটা নেহাতই কপালে নেই তোমার।'

পার্টির সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলকেশকে। পুলকেশ মল্লিনাথের ছোট ভাই এবং জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর একজন টপ একজিকিউটিভ। তাঁর দায়িত্ববোধ প্রবল। কোনো কাজের ভার দেওয়া হলে সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সুচারুভাবে পুলকেশ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

দু'দিনের মধ্যে ইনভিটেসন কার্ড ছাপা, নিমন্ত্রণ করা, নিউ আলিপুরের বাড়িতে ডেকরেটরদের দিয়ে বিশাল সামিয়ানা খাটানো থেকে শুরু করে কলকাতার নাম-করা কেটারারকে দিয়ে খাবার

সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন।

পার্টিতে আমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রেসের লোকেরা তো ছিলই, কলকাতার টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এবং বিজনেসম্যানরাও রয়েছেন। আর আছেন বিখ্যাত অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ, শিল্পী, গায়ক এবং নানা ক্ষেত্রের বিখ্যাত সব মানুষেরা। সবাই অনুরাধার আন্তর্জাতিক সম্মান প্রাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। স্ত্রীর গৌরবের সামান্য ছিটেফোঁটা মল্লিনাথের ভাগেও জুটল।

সবার প্রশ্নের উত্তরে অনুরাধা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি আর পরিকল্পনা জানালেন। শুধু কলকাতায় নয়, আরো কয়েকটা বড় শহরে তিনি রাস্তার অনাথ ছেলেদের জন্য হোম খুলবেন, কুষ্ঠরোগিদের জন্য আরো ক'টা আশ্রম বসাবেন এবং নিরাশ্রয় মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

প্রেসের লোকেরা একটা কিছু পেলে তার চূড়ান্ত করে ছাড়ে। তারা অনুরাধার সঙ্গে মল্লিনাথকেও হাজার প্রশ্ন করে উত্তর আদায় করে ছাড়ল। প্রেস ফোটোগ্রাফাররা দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে কত যে ছবি তুলল তার হিসেব নেই।

অনুরাধা এবং মল্লিনাথ ইন্টারভিউ এবং ফোটো তোলার ফাঁকে ফাঁকে হাতজোড় করে হাসিমুখে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে থাকেন। অথচ জানেন তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন। কিন্তু এই পার্টিতে যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের মনে হয়েছে, এমন সুখী দম্পতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

ভেতরে দু'জনের যাই থাক, ওপরে চকচকে একটা তবকে মুড়ে সেটা ঢেকে রাখার কৌশল কী আশ্চর্যভাবেই না তাঁরা আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

সুকুমার সান্যালকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একধারে মল্লিনাথকে ডেকে নিয়ে সে নিচু গলায় বলে, 'বম্বেতে অনেক চেষ্টা করেও আপনাকে ধরতে পারিনি। হোটেলের টেলিফোন অপারেটর-দের নিশ্চয়ই ইনস্ট্রাকসান দিয়ে রেখেছিলেন যাতে আপনাকে লাইন না দেয়, তাই না?'

নাঃ, এই সব তুখোড় জার্নালিস্টদের চোখে ধুলো দেবার উপায়

নেই। বিব্রত বোধ করেন মল্লিনাথ। বলেন, 'না না, বম্বেতে আমি প্রচন্ড ব্যস্ত ছিলাম তো। হোটেলে খুব কম সময়ই থেকেছি। তাই—'

'ঠিক আছে, এখানে কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না। দয়া করে আমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে। তা হলেই ইন্টারভিউটা কমপ্লীট হয়ে যাবে।'

'সার্টেনলি।'

'কবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব?'

একটু ভেবে মল্লিনাথ বলেন, 'পরশু দুপুরে অফিসে একবার ফোন করবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

পার্টি পূর্ণোদ্যমে চলছে। তার ফাঁকে নিজের বেড রুমে গিয়ে একবার মণিকাকে ফোন করে আসেন মল্লিনাথ, 'আজ আর তোমার সঙ্গে দেখা হল না। ভীষণ খারাপ লাগছে।'

'আমারও।' মণিকা বলে, 'সন্ধের পর থেকে খুব একা হয়ে পড়েছি। তোমাকে ছাড়া সব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।'

মল্লিনাথ কেমন যেন বিচলিত বোধ করেন। ব্যস্তভাবে বলেন, 'পার্টিটা শেষ হতে হতে দশটা এগারটা হয়ে যাবে। তারপর তোমার ওখানে চলে যাব, ভাবছি।'

'না না, পাগলামি ক'রো না। এখানে তোমাকে আসতে হবে না।' মণিকার কন্ঠস্বর বুঝিয়ে দেয়, সে ভয়ানক চমকে উঠেছে। 'কালই তো দেখা হচ্ছে।'

কিছুটা হতাশই যেন হন মল্লিনাথ। বলেন, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ, আজ যাব না।'

'আজ শুধু নয়, কোনোদিনই তুমি এখানে এসো না।' বলে একটু থামে মণিকা। তারপর আবার শুরু করে, 'পার্টি কেমন চলছে?'

'যেমন চলে। প্রচুর লোকজন এসেছে। খুব হইচই হচ্ছে।' মল্লিনাথ বলেন, 'বুঝতেই পারছ, পার্টিটা না দিলে খারাপ দেখাত। তাই—আই মীন, আমরা সোসাইটিতে বাস করি তো। এটা না দিলে লোকে অন্যরকম মনে করত।'

'মিসেস চৌধুরী খুশি হয়েছেন নিশ্চয়ই ?'

'তা হয়েছেন। তবে তিনিও জানেন আর আমিও জানি, এগুলো বাইরের শো মাত্র। আমাদের সম্পর্কটা কেমন, তোমাকে তো বলেছি। একেবারেই ফাঁপা।'

মণিকা বলে, 'অনেকক্ষণ কথা বলেছ। ফোন ছেড়ে দিয়ে এবার পার্টিতে যাও। হোস্ট বেশিক্ষণ অ্যাবসেন্ট থাকলে খুব খারাপ দেখাবে।'

মল্লিনাথ বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখছি।'

পরদিন সব কাগজে ফলাও করে পার্টির খবর তো ছাপা হয়ই, সেই সঙ্গে মল্লিনাথ এবং অনুরাধার ছবিও। ছবির তলায় ক্যাপশানটা এই রকম : পশ্চিমবাংলার মুখোজ্জ্বলকারী দম্পতি।

এগারো

পার্টির পর তিন চারটে দিন পুরনো রুটিন অনুযায়ী কেটে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন লেকের পাড়ে গিয়ে ঘন্টা দুই গাড়িতে বসে থেকেও মণিকার দেখা পান না মল্লিনাথ। কী হতে পারে তার ? কথার খেলাপ সে তো কখনও করে না। তা ছাড়া কখনও মণিকার জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সে আগে থেকে ঠিক-করা জায়গায় পেঁছে গেছে।

চিন্তাগ্রস্তের মতো বাড়ি ফিরে মণিকাকে ফোন করেন মল্লিনাথ কিন্তু ক্রমাগত 'এনগেজড' সাউন্ড আসতে থাকে। বার দশেক চেষ্টার পরও যখন ফলাফল এইরকম থাকে, বিরক্ত হয়ে ওয়ান নাইন নাইনে ডায়াল করে জানতে পারা যায়, মণিকার লাইন খারাপ হয়ে গেছে। কালও ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিভাবে যে অঘটন ঘটে গেল কে জানে! কলকাতার টেলিফোন কতক্ষণ চালু থাকবে আর কখন বিগড়ে যাবে, কেউ জানে না।

ফোন নামিয়ে, চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকেন মল্লিনাথ। অবিনাশের বাড়িতে

টেলিফোন নেই যে মণিকার ব্যাপারটা জেনে নেয়। সপ্তাহে দু'দিন করে পোস্ট অফিস বা অন্য কোনো জায়গা থেকে ফোন করে অথবা নিজে জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর অফিসে গিয়ে জেনে নেয় তাঁর প্রয়োজন আছে কিনা। যতক্ষণ না নিজে যোগাযোগ করছে, অবিনাশকে ধরার উপায় নেই।

মল্লিনাথ ভেতরে ভেতরে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ একসময় মনস্থির করে ফেলেন, আজই তিনি মণিকার ফ্ল্যাটে যাবেন। যতক্ষণ না তাকে নিজের চোখে দেখছেন, মানসিক চাঞ্চল্য কাটবে না।

মণিকার ঠিকানাটা জানা আছে মল্লিনাথের। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় একটা মারুতি ড্রাইভ করে তিনি নিউ আলিপুর থেকে বেরিয়ে ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে, রাজা সন্তোষ রোড হয়ে সোজা উত্তরে চলেছেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে নর্থ ক্যালকাটার গলিতে মণিকার ফ্ল্যাটটা খুঁজে বার করে ফেলেন মল্লিনাথ। একটা আধবয়সী মেয়েমানুষ, খুব সম্ভব মণিকার কাজের লোক, প্রথমে কিছুতেই তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। অগত্যা বলতে হয়, 'তুমি গিয়ে মণিকাকে বল যার সঙ্গে সে বম্বে গিয়েছিল সে এসেছে।'

মেয়েমানুষটি চলে যায়। একটু পরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে আসে মণিকা। তার চুল উষ্কখুষ্ক, চোখ লাল, শাড়ি এলো-মেলো। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় সে সুস্থ নয়। মণিকা সন্ত্রস্ত কাঁপা গলায় বলে, 'এ কী, তুমি! এই নরকে কখনও আসতে হয়! কেউ যদি চিনতে পারে, কী সর্বনাশ হয়ে যাবে ভেবেছ! কেন এলে?'

মল্লিনাথ বলেন, 'আমাকে কি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবে? তা হলে কিন্তু লোকের দেখে ফেলার বেশি সম্ভাবনা।'

চমকে উঠে মণিকা বলে, 'এসো—এসো।'

মল্লিনাথকে সঙ্গে করে একটা চমৎকার সাজানো ঘরে নিয়ে বসায় মণিকা। তারপর প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে একটা সোফায় নিজেকে এলিয়ে দেয়।

মল্লিনাথ বলেন, 'দু ঘন্টা লেকের ধারে বসে রইলাম। তুমি

এলে না। তখন বাড়ি ফিরে গেলাম কিন্তু খুব রেস্টলেস লাগছিল। ফোন করে দেখলাম তোমার লাইন খারাপ। হঠাৎ তোমার কী হল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তাই চলে এলাম।'

মণিকা বলে, 'দুপুরে ভীষণ জ্বর এল। সারা গায়ে অসম্ভব ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা। তোমাকে খবর যে দেবো তার উপায় নেই। অন্য দিন অবিনাশবাবু দিনে দু'বার আসে। আজ এখনও আসে নি। হয়ত কোনো ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছে।'

'জ্বরটা কি কমেছে, না একই রকম?' বলে মণিকার কপালে হাত রেখে উদ্বিগ্ন সুরে মল্লিনাথ বলেন, বেশ টেম্পারেচার রয়েছে। ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'না। আজ আর কাল দেখি। তারপর না হয়—'

'উঁহু, নেগলেক্ট করা চলবে না। এ পাড়ায় ভাল ডাক্তার আছে তো?'

'আছেন একজন বয়স্ক ডাক্তার, এম. বি. বি. এস। ছেলেবেলা থেকে আমাকে দেখে আসছেন। আমার কনস্টিটিউসন জানেন।'

'তাঁকে এখনই খবর দাও।'

'তা আর দেবো না! তোমার ছবি প্রায়ই কাগজে বেরোয়, ক'দিন আগেও বেরিয়েছে। তিনি এসে তোমাকে চিনে ফেললে? আজ থাক, কাল সকালে বরং ডাকিয়ে আনব।'

'না। আমি চলে যাবার পরই কল দিও।'

মল্লিনাথের উৎকণ্ঠাটুকু ভাল লাগে মণিকার। সে একটু হেসে বলে, 'একটা রাত্তিরে মরে যাব না।'

মল্লিনাথ বলেন, 'আমি তোমার কোনো কথা শুনব না।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, আজই ডাকাব। এখন বল কী খাবে?'

'কিচ্ছু না।'

'প্রথম দিন এ বাড়িতে এলে। কিছু না খেলে কি আমার ভাল লাগে?'

'তুমি সুস্থ হও, তখন খাব।'

মণিকা শিউরে ওঠে, 'তুমি আবার এখানে আসবে নাকি?'

মল্লিনাথ জোর দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই। যতদিন না তোমার জ্বর ছাড়ছে, আমি রোজ রাত্তিরে লুকিয়ে এসে খবর নিয়ে যাব।'

'কিন্তু—'

'আমি ধরা পড়ে যাব, এই ভয় তো ?'

'হ্যাঁ।'

'চিন্তা ক'রো না। পৃথিবীতে মানুষের খেয়েদেয়ে অনেক কাজ আছে। কেউ সর্বক্ষণ আমার দিকে নজর দিয়ে বসে নেই, বিশেষ করে রাত্তির বেলায়।'

'প্লিজ, আমার অনুরোধটা রেখো। তুমি এখানে এসো না। অবিনাশবাবু আজ কোনো কারণে আসেন নি, কাল ঠিকই চলে আসবেন। তাকে দিয়ে তোমাকে রোজ খবর পাঠিয়ে দেবো।'

মল্লিনাথ হাসেন শুধু, এ কথার উত্তর দেন না।

রাত যখন এগারটা, একরকম তাড়া দিয়ে মণিকা মল্লিনাথকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

মল্লিনাথ বলেছিলেন, তাঁর দিকে কেউ তাকিয়ে বসে নেই। কিন্তু তিনি যখন মণিকার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান সেই সময় কোণাকুণি চায়ের দোকানটায় বসে ছিল তরুণ আর পশুপতি। তিনি বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তারা মণিকার বাড়ির পাশে সুধাদের বাড়ির ছাদে চলে যায়। সেখান থেকে ঘরের ভেতরে মণিকা আর মল্লিনাথের অগুনতি ফোটো তুলে ফেলে।

মল্লিনাথ মণিকার অনুরোধ রাখেন নি। পর পর তিনদিন বেশি রাত করে তার কাছে যেতে লাগলেন। তাঁদের অজান্তে সুধাদের বাড়ির ছাদ থেকে ছবির পর ছবি তুলে যেতে লাগল তরুণ।

বারো

রোজ কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন মল্লিনাথ। অফিসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাড়ে ন'টা থেকে পৌনে দশটা। আজও এর ব্যতিক্রম হয় না।

তাঁর জন্য আলাদা একটা লিফট রয়েছে। ওপরে উঠতে হঠাৎ লিফটের আয়নায় লিফটম্যানের মুখটা চোখে পড়তে একটু অবাকই

হয়ে যান মল্লিনাথ। অন্যদিন সামনের দিকে তাকিয়ে শিরদাঁড়া টান টান করে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে সে। আজও দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একই আছে কিন্তু মাঝে মাঝে চোখের কোণ দিয়ে তাঁকে দেখছে। তার দৃষ্টিতে অদ্ভুত ধরনের কৌতূহল, নাকি অন্য কিছু, বোঝা যায় না।

মল্লিনাথের যা স্টেটাস এবং পদমর্যাদা তাতে সামান্য একটা লিফটম্যানকে জিজ্ঞেস করা যায় না, সে ওভাবে তাকিয়ে কী দেখছে ?

ফিফটিনথ ফ্লোরে মল্লিনাথের চেম্বারটা দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায়। দুটো সেকসানের ভেতর দিয়ে সেখানে যাবার রাস্তা।

লিফট থেকে নেমে প্যাসেজ ধরে মল্লিনাথ যখন নিজের চেম্বারের দিকে যাচ্ছেন সেই সময় দু'ধারের এমপ্লয়ীরা উঠে দাঁড়ায়। বহুবার তিনি তাদের বারণ করেছেন কিন্তু কেউ শোনে নি। আসলে এভাবেই তারা মল্লিনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে।

মৃদু হেসে এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে মল্লিনাথ ভেতরে ভেতরে একটু অস্বস্তি বোধ করেন। লিফটম্যানটার মতো এদেরও চোখে মুখে যেন আজ একটু বেশি রকমেরই ঔৎসুক্য।

মল্লিনাথ দাঁড়ান না, অন্যদিনের মতোই সোজা নিজের চেম্বারে চলে যান। গোটা অফিস বিল্ডিংটাই এয়ারকন্ডিশানড। নিজের গদিমোড়া বিশাল রিভলভিং চেয়ারে বসার আগেই একটা বেয়ারা দৌড়ে এসে তাঁর কোট খুলে দিয়ে একধারে একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে। বেয়ারাটার চোখে সেই দৃষ্টি, খানিক আগে এই অফিসের আরো অনেকের চোখেই তিনি যা দেখেছেন।

মল্লিনাথ অফিসে এসেই কাজ শুরু করে দেন। তিনি সীটে বসতে না বসতেই আরেকটা বেয়ারা একগাদা ফাইল এনে তাঁর সামনে একটার পর একটা খুলে ধরতে থাকে। কোথায় সই করতে হবে সেই জায়গাগুলো দেখিয়ে দেয়।

ফাইলগুলোতে কী আছে, মল্লিনাথের জানা। দু'দিন আগেই এগুলোর প্রাথমিক ড্রাফ্‌ট তাঁকে দেখানো হয়েছিল। তিনি কিছু অদল বদল করে দিয়েছিলেন। এখন সেগুলো ফের টাইপ করে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে।

মল্লিনাথ সই করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলতেই দেখতে পান বেয়ারাটা একদৃষ্টে তাঁকে লক্ষ করছে। চোখে তাঁর সেই কৌতূহল, নাকি এক ধরনের চাপা হাসি।

চোখাচোখি হতেই ভীষণ নার্ভাস হয়ে মুখ নামিয়ে নেয় বেয়ারাটা। তারপর মল্লিনাথের সইটই হয়ে গেলে ফাইলগুলো নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

খানিক আগে আবছাভাবে মল্লিনাথ যে অস্বস্তিবোধ করছিলেন সেটা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। হঠাৎ কী এমন ঘটতে পারে যে তিনি রাতারাতি বিশেষভাবে দর্শনীয় হয়ে উঠেছেন?

চিন্তাটাকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিলেন না মল্লিনাথ। কেননা তাঁর এখন প্রচুর কাজ। তাঁদের শ্যামনগর ইউনিটে কাল ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারদের নিয়ে গোলমাল হয়েছিল। তিনি তার সলিউশান বলে দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে জেনারেল ম্যানেজারের কাছ থেকে খবর নেওয়া দরকার। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে, সমস্যা কখনও ফেলে রাখতে নেই, তা হলেই সেটা ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। গোড়াতেই সেটাকে চুকিয়ে ফেলা ভাল।

মল্লিনাথ জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করতে যাবেন, তার আগেই টেলিফোন অপারেটর জানিয়ে দেয়, রাজিন্দর বাজপেয়ী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। মল্লিনাথ লাইনটা দিতে বলেন।

রাজিন্দর উল্লসিত গলায় বলেন, 'আরে ভাই, তুমি এতদিনে অ্যাডাল্ট হলে। রীয়াল সাবালক। কনগ্রাচুলেসনস।'

অবাক হয়ে যান মল্লিনাথ। বলেন, 'তার মানে?'

'শুনলাম একটা বাংলা ফোর্টনাইটলি ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনে একটা প্রস্টিটিউটের সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে কী সব বেরিয়েছে। তোমাদের দু'জনের অনেক ইন্টিমেট ইভেন্টের ছবিও ছাপা হয়েছে। মেয়েটা নাকি দুর্দান্ত দেখতে!'

রাজিন্দার বলতে থাকেন, 'তোমার ভাই জবাব নেই। বম্বেতে ছুকরিটাকে নিয়ে গিয়ে মজা লুটে এলে অথচ এতটুকু টের পেতে দাও নি! ইউ আর রিয়ালি গ্রেট। মেয়েমানুষের ব্যাপারে তুমি আমাদের নাক কেটে নিতে পার।'

মল্লিনাথ চমকে ওঠেন। নিশ্চয়ই রাজিন্দর মণিকার কথা বলছেন। সন্ত্রস্ত গলায় তিনি বলেন, 'কী বলছ রাজিন্দর!'

রাজিন্দর মল্লিনাথের কন্ঠস্বরে ভয় এবং চমকটুকু কতখানি লক্ষ করেন, তিনিই জানেন। বলেন, 'আরে ভাই, একটু-আধটু স্ক্যান্ডাল না থাকলে লাইফ একেবারে ভ্যাদভেদে হয়ে যায়। কামাল কর দিয়া হ্যায়। আচ্ছা, পরে ডিটেলে কথা হবে। এখন রাখছি।'

এরপর আরো কয়েকজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বন্ধুর ফোন আসে। এঁরা কেউ কেউ তাঁর সত্যিকারের শুভকাঙ্ক্ষী, তবে বেশির ভাগই শুভাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে ঘোর শত্রু। তাঁর কোনোরকম ক্ষতি হলে তাঁরা খুশি হন। এঁরা জানতে চান, রঙিন ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনে একটি বেশ্যাকে জড়িয়ে তাঁর নামে যে কেচ্ছা বেরুতে শুরু করেছে তার কতটা সত্যি? ভীত, বিভ্রান্ত মল্লিনাথ শুধু বলেন, এমন কিছু যে ছাপা হচ্ছে সেটা তাঁর একেবারেই জানা নেই।

এভাবে আট দশজনের সঙ্গে কথা বলার পর মল্লিনাথ টেলিফোন অপারেটরকে নির্দেশ দেন, তাঁকে যেন আজ আর বাইরের কোনো লাইন দেওয়া না হয়।

খুবই অসুস্থ বোধ করছিলেন মল্লিনাথ। এয়ারকন্ডিশান্ড অফিসের আরামদায়ক শীতলতার মধ্যে বসেও তিনি গল গল করে ঘামতে শুরু করেছিলেন। পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁর লাম্পট্যের খবর জেনে ফেলেছে, আর তিনি নিজে কিছুই টের পাননি। তাঁর নিজের অফিসের এমপ্লয়ীদের চোখে আজ কেন অতিরিক্ত কৌতূহল আর চাপা হাসি দেখা গিয়েছিল, তার কারণটা এখন বোঝা যাচ্ছে। সবাই নিশ্চয়ই তাঁর স্ক্যান্ডালটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। মল্লিনাথের মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

কিন্তু কিভাবে এমন একটা ব্যাপার সম্ভব হল, ভেবে পান না মল্লিনাথ। বম্বের ব্যাপারটা তিনি আগাগোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একবার ভাবতে চেষ্টা করেন। পাছে ধরা পড়ে যান, সে জন্য মণিকাকে তাঁর কুপেতে পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়নি। অবিনাশের মতো একটা অতীব ধুরন্ধর লোক সর্বক্ষণ তাঁকে আর মণিকাকে এমনভাবে আগলে আগলে রেখেছে যাতে অন্য কারো নজরে তাঁরা

পড়ে না যান। বম্বেতে কোনো জার্নালিস্টের সঙ্গে তিনি কথা বলেননি, এমনকি হোটেলে পর্যন্ত আসতে দেননি। জুহুতে যে গেছেন, তাও অবিনাশের ভাড়া-করা গাড়িতে, নিজেদের অফিসের গাড়িতে নয়।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, বিশেষ একটি জার্নালিস্টের চোখে ধুলো দেওয়া যায়নি। কিন্তু এই সাংবাদিকটা কে? সুকুমার সান্যাল নিশ্চয়ই নয়। এ ধরনের কেচ্ছার ব্যাপারে তাদের কাগজের আগ্রহ নেই। তা হলে কোন কাগজে এই স্ক্যান্ডাল বেরুচ্ছে? কাউকে যে জিজ্ঞেস করবেন, তার উপায় নেই।

অফিসে এক মুহূর্তও ভাল লাগছে না। মাথার ভেতর আগুনের একটা চাকা যেন ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু বেরিয়েই বা যাবেন কী করে? স্ক্যান্ডালের ব্যাপারটা জানার পর অফিসের এতগুলো এমপ্লয়ীর চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

তাঁর একটি খাস বেয়ারা বাইরে সর্বক্ষণ মজুদ থাকে। তাকে ডেকে বলে দিলেন, আজ কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। বাইরে একটা রেড লাইট যেন জেবলে দেওয়া হয়।

মল্লিনাথের চেম্বারের গা ঘেঁষে বিশ্রাম করার জন্য রয়েছে ছোট অ্যান্টি চেম্বার। তিনি সোজা সেখানে চলে গিয়ে শুয়ে পড়েন। ছুটির পর বিশাল অফিস বিল্ডিংটা ফাঁকা হয়ে গেলে তিনি নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েন।

এই বিশাল হাই-রাইজ বাড়িটায় শুধু তাঁদের অফিসই নেই, বিভিন্ন ফ্লোরে ছোট বড় আরো অগুনতি অফিসও রয়েছে। সব অফিস একসঙ্গে ছুটি- হয় না। সে সব জায়গায় এখনও প্রচুর লোকজন রয়েছে, তাছাড়া আছে তাঁদের জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর সিকিউরিটি স্টাফের লোকেরা, লিফ্‌ট ম্যান, ইত্যাদি।

কারো দিকে তাকাতে পারছিলেন না মল্লিনাথ। এতটা উচ্চতায় ওঠার পরও মিডল ক্লাস সুলভ অস্বস্তি আর ভয় ঝেড়ে ফেলতে পারেননি।

কোনোরকমে নিচে নেমে পার্কিং এরিয়ার দিকে যখন মল্লিনাথ যাচ্ছেন, হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ডেকে ওঠে, 'দাদা—'

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই মল্লিনাথ দেখতে পান পুলকেশ দাঁড়িয়ে

আছেন। কাছে এগিয়ে এসে তিনি বলেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অন্তত দশ বার গেছি কিন্তু সব বারই চেম্বারের বাইরে রেড লাইট জ্বলছিল। তোমার পার্সোনাল বেয়ারা বলল, ভেতরে যাবার হুকুম নেই। তাই তোমাকে ধরার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'

মল্লিনাথ ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন। মুখ নিচু করে বলেন, 'আমার শরীরটা ভাল ছিল না।

পুলকেশ রুক্ষ গলায় বলেন, 'না।'

'মানে ?'

'তোমার শরীর ঠিকই ছিল।'

বিহ্বলের মতো মল্লিনাথ বলেন, 'শরীর ঠিক ছিল !'

পুলকেশ বলেন, 'নিশ্চয়ই।' তাঁর হাতে পাকানো ট্যাবলয়েড কাগজ ছিল। সেটা মল্লিনাথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে এবার বলেন, 'এটার জন্যে তুমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাওনি। শরীর খারাপের বাহানা করে লুকিয়ে ছিলে।'

পুলকেশ কড়া ধাতের মানুষ, যে কোনো ব্যাপারে চাঁছাছোলা ভাষায় তিনি মুখের ওপর বলে দিতে পারে। তাঁর মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা রয়েছে। নিজের দাদা বা জেনিথ এন্টারপ্রাইজেস-এর সর্বেসর্বা হলেও মল্লিনাথকে তিনি রেয়াত করেন না। পুলকেশ থামেননি, 'এ আমি ভাবতে পারিনি। এত নিচের লেভেলে তুমি নেমে গেছ ! তুমি ছিলে আমাদের ফ্যামিলির আইডল। সবাই আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর তুমি আমাদের সবার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলে ! আজ বাড়ি যাও, তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে। ছিঃ ছিঃ—'

মল্লিনাথ তাঁর এই রূঢ়, স্পষ্টভাষী ভাইটিকে মনে মনে কিছুটা ভয়ই করেন। নিঃশব্দে, মাথা নিচু করে তিনি গাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

মণিকার জ্বর ছেড়ে গেছে। এখন সে সুস্থ। অসুখের পর আজ প্রথম তার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে যেতে ইচ্ছা করে না। সোজা বাড়ি চলে যান। ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনটা না দেখা পর্যন্ত তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

নিউ আলিপুরে ফিরে মল্লিনাথ প্রথমেই খবর নেন অনুরাধা বাড়ি আছেন কিনা। 'নেই' জেনে আপাতত একটু স্বস্তি বোধ করেন। অবশ্য অনুরাধার সঙ্গে আজ হোক কাল হোক, দেখা তাঁর হবেই। দেবীর ইমেজওলা, বিখ্যাত স্ত্রীর মুখোমুখি কিভাবে হবেন সেটা ভাবতেও এই মুহূর্তে তাঁর সাহস হয় না।

আজ রাত্তিরে ডিনার খাবেন না, জানিয়ে দিয়ে মল্লিনাথ দ্রুত নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। স্নান সেরে, পোশাক বদলে বিছানায় শুয়ে পুলকেশের দেওয়া ট্যাবলয়েড কাগজটা খুলে ফেলেন। ছ'পাতা জুড়ে মণিকা আর তাঁর অজস্র ছবির ফাঁকে ফাঁকে লেখাটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই প্রথম ইনস্টলমেন্ট। বম্বে মেল থেকে ভি. টি স্টেশনে নামার পর থেকে গেস্ট হাউসে মণিকার কাছে তাঁর যাওয়া পর্যন্ত প্রথম কিস্তিতে 'কভার' করা হয়েছে। গেস্ট হাউসে তাঁর ছবি, যে সুইটে মণিকাকে রাখা হয়েছিল তার বাইরের দরজায় পেতলের নম্বরসুদ্ধ ছবি, মণিকা দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে—তার ছবি, বীচের দিকে সুইটটার ব্যালকনিতে মণিকার মুখোমুখি বসে থাকার ছবি, এমনি দশ বারোটা রঙিন ফোটো দেখা যাচ্ছে। লেখাটার মধ্যে একটা অক্ষরও মিথ্যে নয়। লেখকের নাম তরুণ দত্ত।

সুকুমার তার বন্ধু একটা ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনের রিপোর্টারকে ইন্টারভিউ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। সে-ই তরুণ কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

কাগজটা খাটের একধারে রেখে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়েই থাকেন মল্লিনাথ। সমস্ত ব্যাপারটা যখন জানাজানিই হয়ে গেছে তখন তাঁর কী করা উচিত, সেটা স্থির করা যাচ্ছে না।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, খেয়াল নেই। হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসেন। ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই মণিকাব ভয়ার্ত গলা ভেসে আসে, 'পাক্ষিক দিনকাল-এ আমাদের সম্বন্ধে যা বেরিয়েছে, দেখেছ?'

মল্লিনাথ বলেন, 'দেখেছি।'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কিসের ভয় ?'

'নিজের সম্পর্কে কিছু ভাবছি না কিন্তু তোমার কী হবে ?'

মল্লিনাথ উত্তর দেন না।

মণিকা এবার বলে, 'তোমাকে এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলে নি ?'

মল্লিনাথ একটু চিন্তা করে বলেন, 'সেভাবে কেউ কিছু বলে নি। তবে রিঅ্যাকসান যে হয়েছে সেটা বুঝতে পারছি।' মণিকা কষ্ট পাবে, সে জন্য পুলকেশের কথাটা আর জানান না।

'আমার জন্যে তোমার সর্বনাশ হয়ে গেল। এতবড় একজন মানুষ তুমি। তোমার সব সম্মান, মর্যাদা আমি নষ্ট করে দিলাম।'

'তোমার জন্যে কিছুই হয় নি। আমিই তোমাকে বম্বে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মণিকা জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী করবে, ভাবছ ?'

মল্লিনাথ বলেন, 'তোমাকে সেদিন বলেছিলাম, একটা ডিসিশান নিতে হবে। এবার সেটা নেবো।'

'দেখো, এমন কিছু ক'রো না যাতে তোমার ক্ষতি হয়।'

'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

'আচ্ছা, এখন রাখছি।' লাইন কেটে দেয় মণিকা।

এরপর আর ঘুম আসে না মল্লিনাথের। বিছানায় ছটফট করতে থাকেন তিনি শেষ পর্যন্ত উঠে গিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েন। নতুন করে চোখের পাতায় ঘুম নামার আগেই মণিকা সম্পর্কে তিনি চরম সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলেন।

তেরো

পরদিন ঘুম ভাঙতে অনেক দেরি হয়ে যায় মল্লিনাথের। মুখ-টুখ ধুয়ে দরজা খুলতেই তাঁর খাস বেয়ারা এসে দুটো খবর দেয়। এক, ম্যাসাজের লোক ঘন্টাদেড়েক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। দুই, পুলকেশও এসেছেন, তিনি অনুরাধার ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। চাকরটাকে ওঁরা বলে দিয়েছেন, মল্লিনাথের ঘুম

ভাঙলে যেন তাঁদের জানানো হয়।

শেষ খবরটা চাঞ্চল্যকর। কেননা, ফুলশয্যার পরদিনই সেই যে অনুরাধা তাঁদের যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাট থেকে চলে এসেছিলেন তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে স্বামী ছাড়া শ্বশুরবাড়ির আর কারো যোগাযোগ ছিল না। পুলকেশরা অনুরাধার এই অন্যায় ব্যাপার-টাকে খুবই অসম্মানজনক মনে করেছিলেন। প্রিয়তোষ এবং চন্দ্রাবতীর মৃত্যুর পর তাঁদের শ্রাদ্ধে দু'বার সামাজিক কর্তব্য পালন করতে আসা ছাড়া যোধপুর পার্ক থেকে আর কেউ কখনও এ বাড়িতে আসে নি। এমনকি ক'দিন আগে এ বাড়িতে যে পার্টি হয়ে গেল তার সব ব্যবস্থা করে দিলেও পুলকেশ এখানে আসেন নি। আসলে অনুরাধাকে মল্লিনাথের বাড়ির লোকেরা ঘৃণা করেন। অন্য কেউ না পারলেও সে কথাটা পুলকেশ অনুরাধার মুখের ওপরেই অনেক আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই পুলকেশ যে নিউ আলিপুরের বাড়িতে আচমকা এসে হাজির হবেন এবং অনুরাধার ঘরে বসে কথা বলবেন, এই ঘটনাটা সত্যিই চমকপ্রদ। যাঁদের মধ্যে বছরের পর বছর কোনোরকম যোগাযোগ নেই, পরস্পরের সম্পর্কটা যেখানে শুধুমাত্র ঘৃণা আর বিদ্বেষের, সেখানে এই সকালবেলায় কোন গূঢ় বিষয়ে তাঁরা পরামর্শ করতে বসেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না মল্লিনাথের। প্রাথমিক বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে তিনি বেয়ারাটিকে বলেন, 'ম্যাসাজের লোকটাকে আজ চলে যেতে বল। আর মেমসাহেবদের খবর দাও, ইচ্ছে হলে ওঁরা আমার ঘরে আসতে পারেন।'

মিনিট পাঁচেক পর পুলকেশকে সঙ্গে করে অনুরাধা মল্লিনাথের ঘরে চলে আসেন। দরজা বন্ধ করে তাঁর মুখোমুখি বসে বলেন, 'তোমার রুচি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। কাল যেখানে যেখানে গেছি সবাই মুখ টিপে হেসেছে আর এমনভাবে তাকিয়েছে যে লজ্জায় আমার মাথাটা কাটা গেছে।'

পুলকেশ বলেন, 'দাদা, লুক—এ ব্যাপারে আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। স্ক্যান্ডালটা আর যেতে স্প্রেড না করে সে জন্যে বৌদির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা একটা প্ল্যানও করেছি।'

স্ত্রী এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন মল্লিনাথ কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, মণিকার সঙ্গে তাঁর ব্যাপারটা যাতে আর না চাউর হতে পারে আপাতত সেটাই ওঁরা চাইছেন। সতর্কভাবে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কী প্ল্যান ?'

পুলকেশ বলেন, 'ঐ কাগজটায় সবে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট বেরিয়েছে। পরের ইনস্টলমেন্টগুলো যাতে আর না বেরোয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিভাবে ?'

'টাকা ছড়ালে কী না হয় ?'

'যদি তাতেও না হয় ?'

'তখন তুমি স্ট্রেট ঐ কেচ্ছাটা অস্বীকার করবে। আমরা এক কোটি টাকার ডিফেমেসানের মামলা করব। বড় ব্যারিস্টার লাগিয়ে ডেটের পর ডেট নিয়ে ওদের জিভ বার করে ছাড়ব।'

মল্লিনাথ বলেন, 'তাতে লাভটা হবে এই, এখন একটা কাগজে বেরুচ্ছে, মামলা করলে সবগুলো ডেইলির ল' কোর্ট কলমে কেসটা আরো ফলাও করে ছাপা হবে।'

পুলকেশ বলেন, 'যাতে অন্য কাগজে ছাপা না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। তোমাকে ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

এবার নিজেকে দৃঢ় করে নেন মল্লিনাথ। বলেন, 'ঐ কাগজে যা বেরিয়েছে তার একটা শব্দও মিথ্যে নয়। তাছাড়া আমার ধারণা ওদের হাতে আরো প্রচুর ছবি আছে যা দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া যাবে মণিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক কী। জুহুর সেই গেস্ট-হাউসের বয় বেয়ারা ম্যানেজারদের ওরা উইটনেস হিসেবে ডাকবেই। তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ?'

পুলকেশের বরাবরই ধৈর্যটা ভীষণ কম। অসহিষ্ণুভাবে তিনি বলেন, 'ওসব আমার ওপর ছেড়ে দাও। মামলা যদি সত্যি সত্যিই করতে হয়, তুমি কিছুদিনের জন্যে ইন্ডিয়ার বাইরে চলে যেও। ফিরে এসে দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে।'

মল্লিনাথ বলেন, 'আমি কোথাও যাব না। মণিকার সঙ্গে

আমার সম্পর্কটাও অস্বীকার করব না।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন অনুরাধা। তাঁর মুখ কঠোর হয়ে ওঠে। বলেন, 'ওই মেয়েটাকে নিয়ে তুমি কী করতে চাও ?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মল্লিনাথ পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'আমাদের বিয়ে হয়েছে ক'বছর ?'

একটু থতিয়ে যান অনুরাধা। বলেন, 'হঠাৎ এ কথা ?'

'দরকার আছে। আচ্ছা আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি। পনের বছর আগে বিয়েটা হয়েছিল।' মল্লিনাথ সরাসরি স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এই পনের বছরে তোমার কাছে আমি কী পেয়েছি, বল ?'

অনুরাধা বলেন, 'তুমি কী বলতে চাইছ ?'

'বলতে চাইছি—' কন্ঠস্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে মল্লিনাথ বলেন, 'প্রথম দিকে তোমার আভিজাত্য আর প্রেডিগ্রির দম্ভ আমাকে প্রতিদিন অসম্মান করেছে। কোনোদিন স্বামী তো দূরের কথা, মানুষের মর্যাদা পর্যন্ত আমাকে দাও নি। তারপর তুমি দেবী হয় গেলে, দেশে-বিদেশে তোমার বিরাট ইমেজ। দিনের পর দিন তুমি আমাকে দূরে, আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছ।'

'তাই একটা থার্ড ক্লাস প্রস্টিটিউটের কাছে গিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়েছ! ছিঃ—ছিঃ—' অনুরাধার কন্ঠস্বর ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে, 'আমাদের জন্যে কী পাও নি তুমি ? সুখ আরাম টাকা—কোনটার অভাব তোমার ?'

'অভাব একটাই।'

'কী সেটা ?'

'একজন সত্যিকারের স্ত্রীর। অভিজাত দাম্ভিক মহিলা নয়, নয় একজন দেবী, আমার প্রয়োজন একটি রক্তমাংসের নারীর।'

'ওই বেশ্যাটার মধ্যে বুঝি সেই নারীকে আবিষ্কার করেছ ?'

'হ্যাঁ।'

চোখের তারা দপ দপ করতে থাকে অনুরাধার। কর্কশ স্বরে বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে প্রস্টিটিউটটা এখন তোমার ধ্যানজ্ঞান, ওকে ছাড়া তোমার চলবে না।'

মল্লিনাথ চুপ করে থাকেন।

অনুরাধা কন্ঠস্বর আরো চড়িয়ে দেন, 'একটু আগে উত্তর দাও নি। আমি জানতে চাই ও মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে ?'

মল্লিনাথ বলেন, 'ও যাতে সামাজিক সম্মান পায় সেই চেষ্টা করব।'

অনুরাধা নিজের মর্যাদা, স্টেটাস, শিক্ষাদীক্ষা—সব ভুলে চিৎকার করে ওঠেন, 'তার মানে তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও !'

মল্লিনাথ জবাব দেন না।

অনুরাধা বলেন, 'দেশের আইনকানুন জানো ? পলিগ্যামির পানিশমেন্ট সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে ?'

মল্লিনাথ বলেন, 'আছে। তুমি আমাকে অব্যাহতি দিলেই সমস্ত প্রবলেমের সলিউসান হয়ে যায়।'

'তুমি ডিভোর্স চাইছ ?' অনুরাধার সমস্ত চেহারাটা হিংস্র হয়ে ওঠে। তিনি বলতে থাকেন, 'তুমি শুনে রাখো. ডিভোর্স আমি দেবো না।'

'নিজের নামের সঙ্গে আমার পদবীটাই শুধু জুড়ে রেখেছ। এটুকু ছাড়া তোমার আমার মধ্যে কোনোরকম সম্পর্ক আছে কি ? এই ফার্সের জের সারা জীবন টেনে চলার কোনো মানে হয় ?'

'আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। ডিভোর্স তোমাকে আমি দেবো না, দেবো না—'

'আমি চেষ্টা করে দেখব কিভাবে ওটা আদায় করা যায়।'

ওধার থেকে পুলকেশ চেঁচিয়ে ওঠে, 'দাদা !'

বিপুল কর্তৃত্বে অসম্ভব গম্ভীর গলায় মল্লিনাথ বলেন, 'একটি কথাও তুমি বলবে না।'

কিন্তু একগুঁয়ে, গোঁয়ার পুলকেশ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চিৎকার করে ওঠেন, 'কিন্তু এ আমি হতে দেবো না, দেবো না, দেবো না।'

আরো একটা সপ্তাহ কেটে যায়।

এর মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে পে'ৗছে গেছে। অনুরাধা আর পুলকেশ মল্লিনাথকে আটকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রাণপণে কিন্তু তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন।

এর মধ্যে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে দু হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা বিশাল ফ্ল্যাট নেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ইন্টেরিয়র ডেকরেটররা জানিয়েছে, মাসখানেকের ভেতর ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে গুছিয়ে ওরা ঠিক করে দেবে।

মল্লিনাথ তাঁর পুরনো রুটিনটা বজায় রেখেই চলেছেন। মণিকার সঙ্গে রোজই দেখা হচ্ছে, তাকে সাদার্ন অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটটা বারকয়েক দেখিয়েও এনেছেন।

মল্লিনাথ ভেবে রেখেছেন, ফ্ল্যাট রেডি হয়ে গেলে মণিকাকে নিয়ে তিনি সেখানে গিয়ে থাকবেন। তারপর ডিভোর্সের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

আরো দিন দশেক বাদে নিউ আলিপুরে নিজের ঘরে সবে ঘুম ভেঙেছে মল্লিনাথের কিন্তু তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে কানে লাগাতেই অবিনাশের আর্ত কন্ঠস্বর ভেসে আসে, 'স্যর, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

তার গলায় ভয় আতঙ্ক এবং কাঁপুনি মিলিয়ে এমন একটা ব্যাপার ছিল যাতে চকিত হয়ে ওঠেন মল্লিনাথ। বলেন, 'কী হয়েছে?'

'কাল মাঝ রাত্তিরে কেউ মণিকাকে খুন করেছে।'

মল্লিনাথের হাত থেকে টেলিফোনটা আলগা হয়ে খসে পড়ে। এমন একটা মারাত্মক পাপ কারা করেছে, মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন তিনি।